ষষ্ঠ অধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস ও শিল্পরীতি -"ঢোঁড়াই চরিত মানস" উপন্যাস গঠনের দিক থেকে মহাকাব্য কি না ? - 'যমুনা আঁচল' উপন্যাসে মহাকাব্যের লক্ষণ - ফণীশ্বর নাথ রেণুর উপন্যাস ও শিল্পরীতি - 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ও 'যমুনা আঁচল' উপন্যাসের শিল্পগত বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য।

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস ও শিল্পরীতি

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এক বিরল ঘটনা। সতীনাথ ভাদুড়ীর সমগ্র রচনায় যে দু'টি উপন্যাস পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। এই সব উপন্যাস গুলির বিষয়বস্তুর সাথে, আঙ্গিককে গভীরভাবে অনুধাবন করাও জরুরী। কারণ এই সৃজনপ্রক্রিয়া শুধু আখ্যান দিয়ে নয়, আঙ্গিক দিয়ে নয় - দু এর মিলনের যোগফল। সতীনাথের প্রত্যেকটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র, অনন্য ও অভিনব তাঁর লেখায় কোন বিষয়ের দ্বিতীয়বার আর্বিভাব হয়নি। বিষয়ে ও শিল্প প্রকরণে সতীনাথের প্রতিভা ছিল নব নব উন্মেষশীলতায় অনন্য সাধারণ। সতীনাথের প্রথম উপন্যাসের আর্বিভাবক্ষনেই তাঁর দৃষ্টি মহিমা ও শিল্প সাধনার বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয় হয়েছিল। "লেখকের আর কোনো লেখা পড়িনি, তার নামও শুনিনি। কিন্তু এ বই একেবারে ওস্তাদ লিখিয়ের লেখা। প্রথম চেষ্টায় জড়তার চিহ্ন কোথাও নেই। শক্তির ছাপ সর্বত্র। নবীনত্বে ঝলমল করছে।" [১] অতুল চন্দ্র গুপ্তের এই ঐতিহাসিক অভিনন্দন সতীনাথের শিল্প প্রতিভার দিকটি নির্দেশিত করেছিল। এই শিল্প প্রতিভার মধ্যে ছিল অসাধারণ শিল্প সচেতনতা। সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের সাথে সতীনাথকে এই বিশিষ্টতাই "লেখকের লেখক' মহিমা দিয়েছিল। এই অনন্য বিশিষ্টতা প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের মন্তব্য স্মরণের সঙ্গে স্মরণীয় " ..... বিষয় বৈশিষ্ট্যে সতীনাথ যতই বাঙলা সাহিত্যে বরণীয় ও স্মরণীয় হোন তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার অনন্য বৈশিষ্ট (*uniqueness*) আরও অন্য কারণে। সে অনন্যতা শিল্প-চেতনা বা রূপায়ন বৈশিষ্ট্যের জন্য। উপন্যাস যুগ-শিল্প হিসাবে

বিকশিত হয়ে অনুমানিক ১৯৪০-১৯৬০ এর সময়ে যে স্তর উপনীত, বাংলার উপন্যাসকে যে লেখকেরা সেই স্তরে শিল্প-সৌকর্যে উত্তীর্ণ করেছেন, সতীনাথ তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ও সম্ভবতঃ শিল্প কারুতায় সেই সাময়িকদের মধ্যে অগ্রগন্য।" [২]

বাংলা উপন্যাসের সচেতন শিল্পি সাধনায় সতীনাথ অনন্য। আখ্যান ও আঙ্গিকের সার্থক মিলনে যে অসাধারণ সৃজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তার সার্থক উদাহরন সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসগুলি। "রবীন্দ্র নাথ ছাড়া আর কোন বাঙালি লেখক সতীনাথের মতো এমন করে টেকনিক ও বিষয়ের অভেদ ধ্যান করেন নি। বিষয় নিরীক্ষায় বরন্চ সতীনাথ আরো বেশী সুনির্ভর - বলা যায় বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে একটু বাইরে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গ সন্ধান ও ধ্যান করেছেন। তাঁর এই প্রসঙ্গ-সন্ধানের অনন্যতার সঙ্গে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা-পট এমন শ্লিষ্ট হয়ে আছে যে, যখন আর এই প্রশ্ন নিরর্থক - কেন সতীনাথ পুর্ণিয়া-অন্চল-সীমার বাইরে এসে বৃহৎ মেট্রোপলিটান পটভূমিতে তাঁর প্রসঙ্গ খোঁজেননি। বৃহৎ মেট্রোপলিটান পটভূমিতে নাগরিকদের উপর কোনো একটা বিশু-ধারনা চাপিয়ে দেবার ব্যাপারে অনীহা থাকে। এবং Urbanisation means a structure of common life in which the diversity and the dis-integration of tradition are paramount অথচ সতীনাথের বিশুতত্ত্বে ট্র্যাডিশনেরই পরীক্ষা ঘটেছে নানাভাবে - তার বিপন্নতার মধ্যেও তার পরমায়ুর রহস্যকে লেখক কখনো উপেক্ষা করেন নি। সুতরাং 'polis' থেকে দূরে জেলা শহর তার মফস্বলীয় মন্থরতায় যেখানে ট্র্যাডিশনকে বিদায় দিতে পারেনি কিন্তু নানা দিক থেকে, অথবা ভিতর থেকেই এদিকে ওদিকে মুচড়ে গেছে - সেখানকার সামাজিক স্তর বিন্যাস ও পরিবার জীবন সতীনাথের নিরীক্ষার বিষয় হয়েছে। সে জন্যেই বলা যায়, তার উপন্যাসগুলির পট ও পটবিধৃত প্রসঙ্গ অভিনব এবং অঙ্গাঙ্গী, দুঃসাহসী এবং সম্পূরক।" [৩]

'জাগরী' থেকে শুরু করে 'দিগভ্রান্ত' পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত ও প্রতিক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি মানুষের নিগূঢ় অন্তর্গতির রূপায়ণ - তাঁর উপন্যাসের

ভাষা তাই মনোলোকের ভাষা। পূর্ণিয়ার মত একটা ছোট মফস্বল নগর, যার সামাজিক স্তরবিন্যাস ঠিক 'রিজিড' হয়ে ওঠেনি, যেখানকার সার্বিক কাঠামো থেকে গ্রামীনত্বের এখনো ঘুচে যায়নি, সেই শহরের মানুষগুলির মানসিক অখণ্ডতার যে সব বিপর্যয় ঘটে, বাইরের ঘটনা তত নয়, সেই মানস বিপর্যয় - তার জটিল আঁকা বাঁকা স্রোত সতীনাথের বিষয়। একটা পরিবার-জীবনে নানা ভাঙচুর ঘটে যাওয়া, এটা একটা আধুনিক মেট্রোপলিসে বড় কথা নয় - কিন্তু পূর্ণিয়া বা অনুরূপ কোনো মফস্বল 'টোনে' যেখানে এদেশীয় ট্র্যাডিশনাল পারিবারিক প্যাটার্ণ তখনো আঁট সাঁট ছিল, সে জায়গায় রিলেশন বা সম্পর্ক সূত্র গুলির টানা হেঁচড়ায় যে টেনশন্ সৃষ্ট হয় সেটার আকর্ষণ লেখকের কাছে সুতঃই অনতিক্রম্য। সতীনাথের দুই ধরনের উপন্যাসেই এই সম্পর্ক সূত্রগুলির টেন্শনের পরীক্ষা হয়েছে। দুই ধরনের উপন্যাস বলতে আমি বোঝাতে চাইছি 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের একটা শ্রেণী। প্রথম শ্রেণীতে সময়ের ইতিহাস নির্দিষ্ট গতিবেগের ধাক্কায় 'রিলেশনগুলির আত্মপরীক্ষা - আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ইতিহাস-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-জীবনগুলির আত্মযোচন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে 'চিত্রগুপ্তের ফাইল', আলাদা দাবী তার। ফ্রেমটুকু সেখানে প্রথম শ্রেণী থেকে নেওয়া, বিষয় নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে - লেখকের একমাত্র প্রচলিত অর্থে প্রেমের উপন্যাস, সেখানেও কিন্তু চরিত্রগুলির আত্মযোচনই লেখকের অভিপ্রেত।

সতীনাথ বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত 'চরিত্র' সৃষ্টি করেন নি। আমরা বাংলা কথাসাহিত্যে যাকে 'চরিত্র'বলি, তিনি সে অর্থে চরিত্র সৃষ্টি করেন না। ব্যক্তি চরিত্র নয়। ব্যক্তি-চেতনার নানারূপ, তাদের অভিজ্ঞতা যা চেতনারই অন্য নাম, তার স্মৃতি লোকের নানা তরঙ্গে তার মুখ্য অংকণীয়। অর্থাৎ চরিত্র বলতে তিনি বুঝতেন চেতনা। চেতনাগুলি কখনো পরস্পরের সঙ্গে মেলে না - তাদের স্বাতন্ত্র্যই কৌতূহলের বিষয়। অবাক করে দেয় সতীনাথের দৃষ্টির সর্বত্রগামিতা - অন্তর্জগতেও যেমন বহির্জগতেও তেমন, অসামান্য তার দর্শন ও গ্রহণ শক্তি। 'জাগরী' থেকে 'দিগভ্রান্ত' পর্যন্ত পরীক্ষার শেষ নেই। বিষয়বস্তুর

সাথে বিবর্তিত হয়েছে আঙ্গিক-প্রকরণও। "আঙ্গিকের উদ্ভাবনায় এত অভিনবত্ব এত বৈচিত্র, সযত্ন বিচার, পরিশ্রম সূক্ষ্ম মাত্রাবোধ(Sense of proportion) যে কোন সাহিত্যিকের পক্ষে গৌরবের কথা, আত্মকথন(জাগরী) মধ্যস্থ প্রথম পুরুষের কথন (চিত্রগুপ্তের ফাইল) অন্যান্য শিল্প-রীতির সার্থক প্রবর্তন (সত্যি ভ্রমন কাহিনী ও সংকট স্মরণীয়) নিরর্থক নয়। শিল্প কৌশলের সুনিপুন উদ্ভাবন - যেমন চেতনা প্রবাহ, interior monologue, free association, flash back, montage প্রভৃতি আঙ্গিক ও কৌশলের সার্থক সাঙ্গীকরন - উৎকট্টতা বিমুক্ত করে এই সব রীতি ও পদ্ধতির সুনিয়মিত (well balanced) প্রয়োগ - এসব সতীনাথের নামের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের মনে গাঁথা হয়ে আছে।"[8]

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথের মত এত সচেতন শিল্পী দুর্লভ। যে আঙ্গিক-কৌশল-রীতি-পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ তিনি বাংলা উপন্যাসে করেছেন, তার প্রকরণ বাংলা সাহিত্যে এত সুপরিচিত ছিল না। সতীনাথের সার্থকতা তিনি এই সব পদ্ধতির মর্মসত্যকে আত্মীকরণ করে নিজের বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে সেই রীতি পদ্ধতির সাঙ্গীকরণে বাংলা কথা সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করেছেন।

বিহারের মানুষজন এবং বিহারের ভূ-প্রকৃতি আশ্রয় করে সতীনাথের কথা সাহিত্য রচিত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ভৌগোলিক অর্থেই বিহারকে অতিক্রম করে গেছেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছে অভিজ্ঞতা। সতীনাথ নিছক কল্পনা বিলাসে তেমন আস্থাবান ছিলেন না। অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর লেখার প্রধান এবং একমাত্র ভিত্তি। সাহিত্যিক জীবনে সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রবেশ তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফসল হাতে নিয়ে।

"জাগরী' প্রথম প্রকাশিত হবার পরে গল্পাংশ বাদ দিয়েও অনেক পাঠকের কাছে তার একটা প্রধান আকর্ষন ছিল জার্নালিজম্-সুলভ গুন, অর্থাৎ জেলে বিভিন্ন শ্রেণীর বন্দীর দৈনন্দিন জীবনযাপনের জ্বলজ্যান্ত পুংখনাপুংখ বিবরণ'[৫] সতীনাথ নিজেও তাঁর লেখার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়, এটাকে তার আঙ্গিকের একটা দরকারি অংশ

বলে ভাবতেন, কিন্তু আবার সঠিক ভাবেই 'খুঁটিনাটি'-র ওপর জোর দিতে গিয়ে মূল কথাটা হারিয়ে যাবার বিপদ সম্পর্কে নিজেই নিজেকে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন (দ্রঃ - (ক) 'ঢোঁড়াই' : সতীনাথ ভাদুড়ী। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ২য় খন্ড। গ্রন্থ প্রসঙ্গ পৃঃ ৪১৬, 'এখন মনে হয় অত খুঁটিয়ে বিবরন না দিলেই হত যে ঢোঁড়াই এর চরিত্র সমস্ত চেষ্টার কেন্দ্রীয় আবেদন, সেইটাই কি পুংখনাপুংখ বিবরনের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি ? (খ) 'সত্যি ভ্রমন কাহিনী' সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২২৭ : 'লিখতে তার ভালো লাগেনা। তবু সে হয়ে পড়েছিল একজন লেখক দশচক্রে পড়ে। বড় লেখক যে সে কোনদিন হতে পারবে না তা সে জানে, কেননা খুঁটিনাটির ওপর তার এত ঝোঁক যে আসল জিনিষটাই যায় কলম এড়িয়ে)।

'জাগরী' এবং বিশেষ করে 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে' উপন্যাসের একটি বড় সম্পদ হয়ে দাঁড়ায় পূর্ণিয়া তথা বিহারের সাধারন মানুষের জীবনের সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এবং এই জীবনেরও একটি অবিকল বিশ্বস্ত ছবি যে তাঁর লেখায় আমরা পাই তার জন্যও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কাছে ঋণী। এর সঙ্গে তুলনায় তাঁর বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্রন যেন অনেক পল্লবগ্রাহী বলে মনে হয়। তাঁরসাসাহিত্যিক কল্পনার সীমা যেন তাঁর রাজনৈতিক চেতনাই বেঁধে দিয়েছে। 'সত্যি ভ্রমন কাহিনী' লেখাটি তো অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে আত্মজীবনীমূলক। কিন্তু সেখানে প্রচুর অনুপুংখ থাকলেও জীবনের কোনো সামগ্রিক ছবি নেই। প্যারিসকে লেখক যেন ইচ্ছাপূরনের স্বপ্নরাজ্যে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকলেই যে লেখক তা দিয়ে সাহিত্যিক বাস্তব সৃষ্টি করতে পারবেন এমন মনে করার কোনো কারন নেই। সতীনাথের ক্ষেত্রে আমরা দেখি সবচেয়ে গভীর বাস্তববোধ তিনি সেখানেই সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর রাজনৈতিক চোখকে খুলে দিয়েছে।

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কাহিনীমূলক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য স্বভাবতই লেখক সচেতন ভাবেই এই কাঠামোকে নানাভাবে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করেছেন। 'জাগরী'

'চিত্রগুপ্তের ফাইল' ও 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' - এই তিনটি উপন্যাসের প্রত্যেকটিতেই নিছক গঠনগত কিছু অন্যতা রয়েছে। 'জাগরী'তে এক রুদ্ধশ্বাস রাত্রিতে একটি পরিবারের জীবনের ঘটনাবলী ঐ পরিবারভুক্ত চারজন মানুষের জবানিতে চাররকমভাবে আমাদের শোনানো হয়েছে। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসটি সতীনাথ 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে'র পরে লিখতে শুরু করে আগে শেষ করেন। এই উপন্যাসটি শুরু হয় নায়ক ইউনিয়ন-সংগঠক অভিমন্যু সিং-এর চিতার পাশে। ত্রিকালদর্শী চিত্রগুপ্ত কিছু টুকরো সাক্ষ্যপ্রমান সংগ্রহ করে এই বিতর্কিত চরিত্রটির একটা পূর্নাঙ্গ ছবি তৈরি করা চেষ্টায় আছেন। উপন্যাসের শেষে শেষে ছদ্মনাম - উদীয়মান গল্পলেখকরা মাল মশলা পাঠালে তিনি উপযুক্ত দক্ষিনার বিনিময়ে পনেরোটি পাঠে তাদের গল্প লিখতে শেখান। 'চিত্রগুপ্ত-বানী-প্রতিষ্ঠান'এর মালিক তিনি, জীবন্ত তথ্যকে কিভাবে জনপ্রিয় সাহিত্যে পরিনত করতে হয় তা তাঁর নখদর্পনে। অর্থাৎ সত্যি অভিমন্যু কেমন ছিল তা শেষ পর্যন্ত ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। 'ঢোঁড়াই-চরিত মানসে'র ঢোঁড়াই লেখকের চেনা সত্যিকারের একজন মানুষ। 'রামচরিত মানসে'র মহাকাব্যিক কাঠামোর মধ্যে কেন এবং কি করে তাকে নতুন আদলে গড়া হল সতীনাথ তাঁর 'ঢোঁড়াই' প্রবন্ধে বেশ বিস্তারিত ভাবেই বলেছেন।

'ঢোঁড়াইচরিত মানস' উপন্যাসের পরবর্তী উপন্যাস ত্রয়ী - 'অম্বিন রাগিনী'(১৯৫৪) সংকট (১৯৫৭) আর দিগভ্রান্ত (১৯৬৬) লেখকের শিল্প প্রয়াসকে এক সম্পূর্ণতায় পৌছে দিয়েছে। জেমস জয়স, ভার্জিনিয় উলফ, অলডাস হাক্সলি, ডরোথী রিচার্ডসন, মার্সেল প্রুস্ত-এর আধুনিক উপন্যাস ১৯১৩ থেকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এ সময়েই প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্র নাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস (১৯১৬)। বাইরের রূপে শিথিল, অসংযত অথচ ভিতরে ভিতরে শিল্পরীতি ও উদ্দেশ্য-সচেতন এই সব উপন্যাসে ইম্প্রেশনের স্থান নিল এক্সপ্রেশন। বাইরের রূপ'কে নয়, জীবনের 'ইনার রিয়্যালিটি'-কে দেখানোই ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। যে নতুন রূপহীনতা (ফর্মলেসনেস) অনুসৃত হয় তা জীবনের অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অন্তঃসংলাপ, চেতনাপ্রবাহ, চিন্তার খাপছাড়া অনুষঙ্গ ও স্বেচ্ছাবিহার, অস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গী, অবচেতন প্রতীক ও সংলাপের তির্যকতা নতুন

রীতির উপন্যাসের প্রধান আয়ুধ। সময়ের ছেদ, চিন্তার বিরতি বা অসংলগ্নতা, নানা 'মোটিফ'-এর জটিল পুনরাবৃত্ত সমাহার - তারই মধ্য দিয়ে উপন্যাসের অগ্রসৃতি ঘটল। সুসংগঠিত, সুনির্দিষ্ট প্লটনির্ভর স্পষ্ট পরিণতি মুখী নিটোল কাহিনী অপসৃত হল।

দ্বিতীয় বিশ্বসমরের পর জীবনের 'ইনার রিয়ালিটি'র সন্ধান আরো তীব্র ও নির্মম হয়ে উঠল, শিল্পরূপ হলো আরো জটিল। ভাষা ও সংলাপের উপর জোর পড়ল। চেতনালোক থেকে অবচেতন লোকে চরিত্রের যাত্রার ইঙ্গিত বহন করে ভাষা হয়ে উঠল, উজ্জ্বল, প্রসাধিত ও জটিল, কনফেশন, ও ডিটেকশন, অপরাধের স্বীকৃতি ও জীবনের সত্যান্বেষনে একালের ঔপন্যাসিক আত্মনিয়োগ করেছেন। সেই সঙ্গে আছে আত্মবিশ্লেষন, যা নির্মম, অকুণ্ঠ ও নিরাসক্ত। তার ফলে উপন্যাসে এসেছে বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিসঙ্গতাবোধ ও বিষাদ। আধুনিক জীবনের এই তিন লক্ষন উপন্যাসে শিল্পরূপ পেয়েছে। এই পরিচিত পৃথিবীকে মনে হয়েছে অচেনা, নিজেকে মনে হয়েছে, 'আউট সাইডার'। তাই নায়কের আত্মসন্ধান আজ ঔপন্যাসিকের-ই আত্মানুসন্ধান।" [৬]

সতীনাথ ভাদুড়ীর শেষ তিনটি উপন্যাস প্রসঙ্গে এই প্রেক্ষাপট জরুরী ও প্রাসঙ্গিক। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার। সতীনাথের মৃত্যুর (৩য় মার্চ ১৯৬৫) চার বছর পরে তাঁর ফরাসি পুস্তক সংগ্রহ চন্দন নগরের ফরাসি ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে (১৯শে জানুয়ারী ১৯৬৯) অর্পিত হয়। এই পুস্তক তালিকা থেকে অনুধাবন করা যায়, সতীনাথের ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে কতো গভীর অধিকার ছিল। এ ক্ষেত্রে অবশ্য স্মর্তব্য, সতীনাথ শেষ তিনটি উপন্যাস 'অচিন রাগিনী', 'সংকট', 'দিগভ্রান্ত' লেখেন ইউরোপ ভ্রমন থেকে ফিরে এসে। ইউরোপ ভ্রমনের আগে লেখা তিনটি উপন্যাস (জাগরী, চিত্রগুপ্তের ফাইল, ঢোঁড়াইচরিত মানস ও পরে লেখা তিনটি উপন্যাসের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুভব করা যায়! প্রথম তিনটি উপন্যাসে দেশকর্মী-রাজনীতিক-সামাজিক চিন্তাশীল লেখক-ব্যক্তিত্বকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। শেষ তিনটি উপন্যাসে সতীনাথ আরো বেশি অন্তর্মুখী। এই অন্তর্মুখিতার পরিচয় প্রথম তিনটি উপন্যাসে চরিত্রের *inner isolation*-এ ছিল, কিন্তু শেষ তিনটি উপন্যাসে তাই প্রধান।

"এই (শেষ) তিনটি উপন্যাসেরই নাম তাৎপর্যপূর্ণ, সংকেতময়। আমাদের পরিচিত জীবনের নিটোল কাহিনী বয়নে তাঁর আগ্রহ নেই। ..... যা লেখা হয়েছে তার চেয়ে আরো বেশি কিছুর আভাস আছে লেখার মধ্যেই। ..... চেতনলোক থেকে অবচেতন-লোকে চরিত্রের নিঃসঙ্গ যাত্রা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিষাদে আক্রান্ত চরিত্রের কনফেশন, অন্তঃসংলাপ, চিন্তার আপাত খাপছাড়া অনুষঙ্গ ও সেচ্ছাবিহারের আড়ালে সংলগ্ন আত্ম-কথন, আপাত শিথিল-গ্রথিত মুহূর্তের সমাহারে এক অখণ্ড জীবনবোধ, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে অপর ব্যক্তি ও সমাজের অদৃশ্য সংগ্রাম, জীবনের অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতির মধ্যে নতুন অর্থান্বেষন, বাইরের সমাজ ও ঘটনার গুরুত্ব অস্বীকার, আধুনিক জীবনের রোগ নির্নয় ও বিশ্লেষণ, মনোগহনের জটিল আঁধার-সন্ধানী আলো নিক্ষেপ, সময় ও স্মৃতি সমবায়ে গঠিত এই নতুন শিল্পজগৎ সতীনাথের শেষ উপন্যাস ত্রয়ীতে রূপ পেয়েছে।" [৭]

বিষয় এবং বিন্যাসে ছ'টি উপন্যাসেই সতীনাথ একেবারে ছ'টি ভিন্ন অভিজ্ঞতার জগৎকে ধরবার চেষ্টা করেছেন, প্রতিটি উপন্যাসে নিজের পূর্বতন স্তরকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন তিনি। সতীনাথের মতো সচেতন পরিশীলিত লেখক বাংলাকথা সাহিত্যে খুব সুলভ নয়।

'ঢোঁড়াইচরিত মানস' গঠনের দিক থেকে মহাকাব্য কি না ?

'ঢোঁড়াইচরিত মানস' দুটি চরণ লিখতে গিয়ে সতীনাথের সামনে আদর্শ ছিল "তুলসীদাসের রামচরিত মানস"। শুধু তাই নয় সতীনাথ চেয়েছিলেন মহাকাব্যের বিশাল আধারে জনজীবনের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন ও বদলের রূপরেখা আঁকবেন। অজস্র কথা উপকথার বৃত্তে, বহু বিচিত্র-চরিত্র ও ঘটনার সংঘাতে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে এক নতুন মহাকাব্য (নব রামায়ন) রচনা করবার বাসনাও অগোচর থাকে না। সাধারণ মানুষকে করতে চেয়েছিলেন 'রামের মতো', কারণ রামের আদর্শ ছাড়া উত্তর ভারতীয়দের মন ভরে না। সাধারন মানুষের কথা ও সাধারণ মানুষের বাসভূমিকে চিরন্তন করতেই রামায়নের

বিশালতা; মহাকাব্যের ব্যাপ্তি লেখকের শিল্পীমানসে এনেছে বিশেষ সচেতনতা, আর 'ঢোঁড়াই চরিতের' পাঠক দুটি চরন পাঠ শেষে পেয়েছে বিশালতার স্বাদ যা অনেকটাই মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত অথচ জীবন মুখর উপন্যাসের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার।

উপন্যাস 'প্রাচীন এপিকের আধুনিক প্রতিভূ'। উপন্যাস ও মহাকাব্যের গঠন প্রকৃতি এক না হলেও উপন্যাসের প্রান লুকিয়ে আছে মহাকাব্যের বিশালতায়, রামচরিত মানসের মহাকাব্যিক কাঠামোর মধ্যে কেন এবং কি করে তাকে নতুন আদলে গড়া হল তা সতীনাথ 'ঢোঁড়াই' নামক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কাহিনী, চরিত্র, ভাব, ভাষা এমনকি ফলশ্রুতিতেও 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' মহাকাব্য লক্ষনাক্রান্ত, মহাকাব্যোপম উপন্যাস।

সব সৎ ঔপন্যাসিকই দায়বদ্ধ - দায়বদ্ধতার ফর্মের কাছে। ফর্মই বিষয়কে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে; ফর্মের সঠিক সচেতনতাতেই ধরা পড়ে বিষয়ের গুরুত্ব, বিষয় বা কনটেন্ট-এর ঘনীভূত রূপ ফর্ম। রামায়নের, বিশেষ করে তুলসীদাসের রামচরিত মানসের কাঠামোটি সতীনাথ বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসটিকে ভাগ করেছেন সাতটি কান্ডে - আদি কান্ড, বাল্য কান্ড, পঞ্চায়েত কান্ড, রামিয়া কান্ড, সাগিয়া কান্ড, লংকা কান্ড এবং হতাশা কান্ড - যদিও এই শেষ কান্ডের নামকরণে তিনি আর রামায়নের প্রতি আনুগত্য রাখতে পারলেন না। জীবনের বিনষ্টি দেখে শেষ পর্যন্ত হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। প্রত্যেক কান্ডের পরিচ্ছেদগুলির নামও রামায়নের অনুসরণে : 'ঢোঁড়াই-এর জন্ম, বস্ত্র লাভের উপাখ্যান, ঢোঁড়াই-এর মায়ের সন্তান বাৎসল্যের বিবরন, দুখিয়ার মার বিলাপ ও প্রার্থনা, সুর্ণসীতা প্রভৃতি। শিশু ঢোঁড়াই-এর বর্ণনায় সতীনাথ লিখেছেন, 'বাওয়া দেখে যে তার গভীর নাভিকুন্ডের উপর তিনটি রেখা পড়েছে, ঠিক বালক রামচন্দ্রজীর যেমন ছিল'। রামায়নের একটা সর্বলোক গ্রাহ্য জীবনাদর্শ ছিল, যা বড় বড় ঘটনার ক্ষেত্রে তো বটেই, দৈনন্দিন জীবনেরও ছিল মাপকাঠি। তাৎমা-ধাঙড়-কোয়েরী সম্প্রদায়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও ছিল এই মাপকাঠি। সতীনাথ তাৎমা-ধাঙড়-

কোয়েরী সম্প্রদায়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যায় তুলসীদাসের বচন মুঠিমুঠি ছড়িয়ে দিয়েছেন উপন্যাসে।

রামায়নের কাঠামোর এই নিশ্চিত অনুসরণ সত্ত্বেও ঢোঁড়াই রামের মধ্যে কোথায় সেই লোকোত্তর শৌর্য আর বীরত্ব ? রাবনের বিনাশ, সীতার উদ্ধার, সীতা বর্জন, সবকিছুর মধ্যেই যে অসাধারণত্ব রামচরিত্রের - ঢোঁড়াই চরিত্রের গতি পরিণতির মধ্যে সে আদর্শের প্রতিষ্ঠা কোথায় ? সতীনাথ একবার ডায়েরিতে নিজেই সংশয় প্রকাশ করে ফেলেছেন যে 'এখন মনে হয়, অত খুঁটিয়ে বিবরণ না দিলেই হত, ও ভাষা ও ভঙ্গী না দিলেই হত। আবার 'এত সব করে, শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াই চরিত্র যা দাঁড়াল তাতে আমি মোটেই তৃপ্তি পাইনি।' এর থেকে কোনো কোনো সমালোচক (দ্রঃ গুনময় মান্না) ঢোঁড়াইচরিত মানস : একটি পুর্ণমুল্যায়ন। সতীনাথ ভাদুড়ী : স্রষ্টার সন্ধানে পৃঃ ৭৩) ধারনা করেন - 'রামায়নের কাঠামো ঢোঁড়াইচরিত মানস'এর হয়তো একটা খোলা মাত্র, যাকে একটা arbitarary কাঠামো বলাও যায়।' কিন্তু এই অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য নয়, যা সর্বজন-গ্রাহ্য তাহল রচনা ও রূপ form এবং content এই দুটি ওতপ্রোত সম্পর্কে জড়িত, তাদের সম্পর্ক দেহ ও প্রাণের, দেহ এবং অলংকারের নয়, সতীনাথ ও form -এর এই অসাধারণ তাৎপর্য সম্বন্ধে যে সচেতন ছিলেন, তা তাঁর ডায়েরি থেকেই জানা যায়, "form is nothing but the power to extract the fullest from the material. তাই এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, সতীনাথের সংশয় সত্ত্বেও যে রামায়নের কাঠামো একটি বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। রামায়নের কাঠামো 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'এর কল্পনা এবং রূপায়নের সহায়ক।

'রামচরিত মানসের' মহাকাব্যিক কাঠামোর মধ্যে কেন এবং কি করে তাকে নতুন আদলে গড়া হল তা সতীনাথ তাঁর 'ঢোঁড়াই' নামক লেখাটির মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উপন্যাস ও সতীনাথের এই আলোচনাটিকে আশ্রয় করে, নিজস্ব যুক্তি-তর্কের সহায়তায় একাধিক সমালোচক 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে'র মহাকাব্যিক গঠনের বিশ্লেষনাত্মক আলোচনা

করেছেন। এঁদের মতামতগুলি নিয়ে আলোচনা করলে এই গঠনের স্বরূপ স্পষ্ট হবে। শৈল্পিক তাগিদের কোন অনিবার্যতা থেকে সতীনাথ এই কাঠামো বেছে নিয়েছিলেন তা স্পষ্ট হবে। ডঃ অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন "সতীনাথ বহুপাঠী ছিলেন, দেশবিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল গাঢ়, ফলে এমন হতেই পারে হোমারের মহাকাব্যের আদলে লেখা জয়েসের - 'ইউলিসিসে'র বিন্যাস তাঁকে ইঙ্গিত দিয়েছিল। দুটি রচনার পার্থক্য আছে - একটি চেতনাপ্রবাহের উপন্যাস, অন্যটির প্রধান লক্ষন বহির্জাগতিক নিষ্ঠা, একটির কালসীমা একদিন, অন্যটির কালসীমা তিরিশ বছরের কিছু বেশি সময়। এই পার্থক্য সত্ত্বেও এমনও হতে পারে, পুরানো মহাকাব্যের ছাঁচে আধুনিক এপিক লেখার প্রেরণা সতীনাথ জয়েসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।" [৮] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অশ্রুকুমার সিকদারের এই অনুমানকে ভ্রান্ত মনে করেন না। তাঁর মতে সতীনাথ সব সময়ে খুঁজতেন দেশজ চরিত্র, স্বাদেশিক, মৃন্ময় আধার - ভারতীয় বাস্তবতা। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে অভিমত ঘোষন করেন - "ঢোঁড়াই চরিতমানস জয়েসীয় আদর্শে মহাকাব্যিক কাঠামো ব্যবহার নয় - একান্ত ভারতীয় এক ঔপন্যাসিকের তিন দশকের ভারতীয় জীবনছন্দের রূপায়নের জন্য দীর্ঘায়ত রামজীবনীকে ব্যবহার। 'চরিত' শব্দটির মূল অভিধা 'জীবনী' বা 'জীবন কথা'। সতীনাথ ঢোঁড়াই চরিত মানসের পরিকল্পিত অলিখিত তৃতীয় খন্ডের নাম ঠিক করে রেখেছিলেন 'উত্তর ঢোঁড়াইচরিত'। এখানেও 'উত্তর রামচরিত' নামটির প্রভাব তিনি ইচ্ছা করেই জাগ্রত রেখেছিলেন। 'ঢোঁড়াই' শীর্ষক প্রবন্ধে নিজ কথায় একাধিক বার 'ঢোঁড়াইরাম' কথাটি তিনি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং রামকথার ভারত বিখ্যাত ফ্রেম তিনি সযত্নে স্মরণ করে নায়কচরিত্রকে সাবয়ব করতে চেয়েছিলেন। আমার বলবার কথাটি এই যে, শৈল্পিক অনিবার্যতা থেকেই এই ফ্রেম ভাবনা এসেছে, যথাসময়ে তা ভেঙেও গেছে, - কোনো অধ্যয়ন হেতুক প্রেরণা এর মূলে আছে কিনা এটা গৌনচিন্তা। 'দেশ' পত্রিকার প্রকাশের কালে যে উপন্যাসটির নাম ছিল 'সটীক ঢোঁড়াইচরিত মানস' তখনো 'সটীক' শব্দটির টীকাভাষ্য সমন্বিত রাম-চরিত মানসের কথা স্মরন করিয়ে দেয় ।" [৯]

প্রশ্ন ওঠে কেন সতীনাথ ঢোঁড়াই কাহিনীকে রামায়ণের কাঠামো দিতে গেলেন ? সতীনাথ হয়তো মনে করেছিলেন অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের পদ্ধতিতে সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখা সাহিত্য প্রচারমূলক হয়ে পড়তে পারে। মানুষের এগিয়ে চলার বিশাল ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস লেখার সমস্যা আছে, সতীনাথ ও এটি বুঝতে পেরেছিলেন - "·····চেষ্টা করেছিলাম যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরতে of essential social factor which determine the world of Dhoral / তখন প্রশ্ন উঠেছিল কী রকম ভাবে সাজানো যায়। একটি particular form - যা গরিব লোকদের নিয়ে লেখা বইয়ে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত (রামপন্থী) সাহিত্যে - সেটা সাহিত্যের পক্ষে একটু স্থূল মনে হয়েছিল আমার। আর উত্তর ভারতের এ যুগের (১৯৪৫-এ যা শেষ হয়েছে) তার পক্ষে অনুপযোগী হতো আমার বিবেচনায়। (ও জিনিষটা marshalling of facts -এর ওপর নির্ভর করে।) আর সত্যের অপলাপও হতো। প্রচারমূলক হওয়ারও সম্ভাবনা। আমার চোখ দিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে যাবার আমার ইচ্ছা ছিল না।"[১০] মালিনী ভট্টাচার্য সতীনাথের এই অভিমত প্রসঙ্গে লিখেছেন - 'খুব স্পষ্ট না হলেও মনে হয় এখানে লেখকের অভিযোগ 'Socialist realism' - কোন ধারার বিরুদ্ধে, যেখানো বর্তমানের পরিচিত 'গরিব লোক'দের ভবিষ্যতের এক মহিমময় আদর্শের ছাঁচে ঢালতে গিয়ে লেখকের ভাষায় সত্যের অপলাপ করা হয়েছে। লেখক মানুষের তথা সমাজের পরিবর্তন শীলতায় বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর পরিচিত বর্তমানকে তিনি বর্তমান হিসাবেই দেখতে চান।"[১১]

রামপন্থী সাহিত্যের উদাহরণ সতীনাথ সরবরাহ করেন নি তবে 'পড়ুয়া' সতীনাথ উল্লেখযোগ্য সবকটি আঙ্গিকের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। ১৯৩৬ খৃঃতে প্রকাশিত 'গোদান'-এর লেখক প্রেমচাঁদসহ উত্তর ভারতের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের পদ্ধতিতে সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখা সাহিত্য প্রচারমূলক হয়ে পড়তে পারে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। হয়ত আঙ্গিক পছন্দের সময় এভাবে বাংলা ও উত্তর ভারতীয় নমুনাগুলির ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হয়ে সতীনাথ দাদুড়ী সম্পূর্ণ নতুন অথচ পুরানো 'রামচরিত মানস'-এর আঙ্গিকে ফিরে গেলেন। বিষয়বস্তুর মত আঙ্গিকেও লেখক আন্তরিক। নতুন বিষয়ের সঙ্গে পুরানো অনুপযুক্ত

আঙ্কিক গ্রহন না করে 'রামচরিত মানসের' আদলে ভারতের সাবেকি সমাজ ব্যবস্থা থেকে নতুন প্রাণোদ্দাদনা নিয়ে পরিবর্তনের মহাকাব্য 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' সৃষ্টি করলেন।

সতীনাথের সমালোচকেরা জানিয়েছেন, 'ঢোঁড়াই' লেখার পিছনে লেখকের রাজনীতিক অভিজ্ঞতা এবং বাংলা-বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজীবনের পরিচয়ই শুধু কাজে লাগেনি, কেবল তুলসীদাসই পর্যাপ্ত ছিল না তাঁর কাছে, 'স্কুলের ছেলের অধ্যাবসায়ে দিনের পর দিন তিনি পড়ে যান মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব বা রাজনীতির বই, উদ্ধৃত করেন তার থেকে অংশের পর অংশ, জুড়ে দেন তাঁর নিজের মন্তব্য ..... তাঁর এই ডায়েরিতে একই সঙ্গে ধরা থাকেন স্পিনোজা থেকে লুকাচ, ইসপ থেকে সিমনদা বোভোয়া। এখানে একদিকে আছেন এ্যাসলি মন্টেগু, অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সদ্য প্রকাশিত বিদেশি বইগুলির নাম, সার্তর বা কামু। জন ওয়েন বা কিংসলি এ্যামিসের নূতনতম লেখাবলী'।[১২]

বস্তুত, সতীনাথ ভেবেছেন, অবিরত ভেবেছেন - 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এর কেন্দ্রীয় ঢোঁড়াইচরিত্র, উপন্যাসের গঠন, ভাষা, বিচিত্র রূপকর্ম নিয়ে। তাঁর ডায়েরিতে এসব লিখে গেছেন ইংরেজিতে, বাংলায়, কখনো আবার চিঠিপত্রে। এ নিয়ে সতীনাথের যেমন অধ্যবসায়, তেমনি যন্ত্রনার অবসান ছিল না। মনে মনে যে - ঢোঁড়াই মূর্তিটিকে তিনি খাড়া করেছিলেন সেটি তাঁকে বিশ্রাম দেয়নি। 'ঢোড়হাই' নামের একটি বাস্তব মানুষকে দেখে সতীনাথ তার এই চরিত্রটির পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু নিজের সৃষ্টি কর্মে সে 'ঢোড়হাই'কে আস্ত রাখতে পারেনি, রাখার উপায়ও ছিল না - 'My work/ creation was not merely representations, but transformation'. এই transformation - এর তাগিদ ছিল লেখকের অস্থির মনলোকে। এই অস্থির মনলোকের জন্যই তাঁর রামায়নের কাঠামোকে চূড়ান্ত বলে গ্রহন করতে প্রশ্ন তুলি। সতীনাথ নিজেই একবার বলেছেন, 'এই ঢোঁড়াইকে এ যুগের শ্রী রামচন্দ্র করবার কঠিন কাজ ছিল আমার সম্মুখে'। আবার ডায়েরিতে লিখে গেছেন, ঢোঁড়াই 'average/typical Indian character', - আবার এক জায়গায়, Dhorai is the type not

average'। 'আসলে, তাঁর সৃজনী ও পর্যবেক্ষনী মন অবিরত টানা পোড়েন বুনছে। প্রশ্ন হয়, আমরা তার কোন কথায় বিশ্বাস করব ? এর একটাই উত্তর হতে পারে : তাঁর সব কথা এবং সৃজনকর্ম মিলে যে সামগ্রিকতার আভাস আনে তারই ওপর।

রামায়ুনের বিশালতা, মহাকাব্যের ব্যাপ্তি সতীনাথের শিল্পী মানসে এনেছিল বিশেষ সচেনতা। ঢোঁড়াইচরিতে'র পাঠক উপন্যাসের দুটি চরণ পাঠ শেষে পেয়েছে বিশালতার স্বাদ যা অনেকটাই মহাকাব্য লক্ষনাক্রান্ত। উপন্যাস ও মহাকাব্যের গঠন প্রকৃতি এক না হলেও উপন্যাসের প্রাণ লুকিয়ে আছে মহাকাব্যের বিশালতায়। প্রাচীন এপিকের আধুনিক প্রতিভূ উপন্যাস। 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে' সেই এপিক লক্ষণ একেবারেই অদৃশ্য নয়। কাহিনী, চরিত্র, ভাব ভাষা এমনকি ফলশ্রুতিতেও 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' মহাকাব্যোপম উপন্যাস।

রামায়ুনের কাঠামোর আশ্রয়ে, পাকৃীর দুপাশের গোটা তিনেক গ্রাম নিয়ে, 'average/typical Indian character' নিয়ে, ঢোঁড়াই-রামকে নায়ক করে, একালের রামকথা লিখিত হল। মহাকাব্যের মতোই এই উপন্যাসের কাহিনী শেষ পর্যন্ত বিশেষ সীমায় আবদ্ধ থাকেনি। তাংমা-ধাঙড়-কোয়েরী সমাজের জীবনধারা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিশাল ভূখন্ডকে ও ভারতবাসীকে স্পর্শ করেছে যাঁর সঙ্গে তুলনা হতে পারে মহাকাব্যের ত্রিলোকব্যাপী পরিধির। অভ্যস্ত আপাত স্থানু জীবনধারা কালপ্রবাহে যে বিস্তার লাভ করেছে তা সীমাতীত রূপরেখার ইঙ্গিত দিয়েছে - আঞ্চলিক জীবনচর্যা সমবেত আধারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে - তাই জীর্ণারন্য শেষ পর্যন্ত মূল্যবোধ বিনষ্ট, দারিদ্রে জর্জরিত লাঞ্ছনাক্রীর্ণ ভারত ভূখন্ডের দ্যোতক হয়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে এ উপন্যাসে। গোপাল হালদার যথার্থই বলেছেন - ইকলজি আর ইকনমি মিলে গড়ে উঠেছে এই আধুনিক মহাকাব্য রচনার 'সশ্রদ্ধ এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রয়াস'। ছোট জিরানিয়া শহর, তার নিকটবর্তী গুটি তিনেক নগন্য জনপদ কে নিয়ে লেখা এই উপন্যাস হয়ে উঠেছে 'সেই অখ্যাত anonymous India -র ঘুমভাঙা নতুন জাগরনেরও বাধাজড়িত পদযাত্রার প্রধাণ মহাকাব্য।'[১৩]

আঞ্চলিকতা এই উপন্যাসের অ-প্রাথমিক লক্ষণ, তার প্রাথমিক লক্ষন বাস্তবতা। সেই বাস্তবতা রুজি রোজগারের, জীবনযাপনের, অর্থনৈতিক বিন্যাসের, রাজনৈতিক অভিঘাতের -আর সেই সব ব্যাপারে জিরানিয়া একটি অঞ্চল হয়েও অনু - ভারতবর্ষ। রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান করে যে অভিজ্ঞতা সতীনাথ অর্জন করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতাকে সৃষ্টীকৃত করেই গড়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসের মহিমান্বিত বাস্তবতা। তথ্যাভিত্তিক অভিজ্ঞতাই তার বাস্তবতার ভিত্তি। কিন্তু শুধু বাহিরঙ্গতা নয়, অন্তরঙ্গতাও এই উপন্যাসের বস্তু-সমগ্রতাকে দৃঢ় করে। 'উনিশ শতকী এপিক -উপন্যাসের সঙ্গে তিনি হয়তো জয়েস ও প্রুস্ত ইত্যাদি ঔপন্যাসিকের অন্তরঙ্গতার শিক্ষাকেও মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তাই বারে-বারে পেয়ে যাই আমরা চরিত্র সমূহের আত্মগত চিন্তাকে - ঢোঁড়াইয়ের মা-র, ফুলঝরিয়ার, বৌকা বাওয়ার, মহতোর, বাবু সাহেবের, সর্বোপরি নায়ক ঢোঁড়াইয়ের। এই সব আত্মগত চিন্তা, চেতনাপ্রবাহের আপাত অগুম্ফিত ধরনে নয় অবশ্য, উপন্যাসের বাস্তবতাকেই বেধ দেয়, এক অতিরিক্ত মাত্রা দেয়।" [১৪]

মহাকাব্যের কাহিনীতে থাকে অলৌকিকত্ব ও বিস্ময় যা পাঠক মনে বিশেষ বিস্ময় ভাব ও রসের সংস্কার ঘটাতে সক্ষম। আর সময়ের দিক থেকেও মহাকাব্যের ব্যাপ্তি কালান্তরের সূচক। ঢোঁড়াইচরিত মানসের কাহিনী অতি সাধারণ মানুষের নিয়ত সংগ্রামের ঘাত প্রতিঘাতে, ব্যর্থতায় ও ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে নিজেকে গড়ে তোলার কাহিনী। সংগ্রামী ঢোঁড়াইয়ের জীবন ধারায় গোটা ভারতবর্ষের মানুষের অধিকার সচেতনতা, আত্মরক্ষা ও আত্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটি এই উপন্যাসে বিধৃত হয়ে আছে যা পাঠককে বিস্মিত ও শ্রদ্ধাশীল না করে পারে না। আর সময় - ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বাধীনতাপূর্ব কালের সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ সংকটকালটিকে লেখক বেছে নিয়েছেন।

ঢোঁড়াইয়ের জন্ম হল ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারের সময়। লেখক পাদটীকায় জানিয়েছেন জিরানিয়ায় প্রথম মোটর গাড়ি আসে ১৯১৩ সালে। ১৯১৭ সালে যুদ্ধের চাঁদা

সংগ্রহের জন্য টুরমন বা টুর্ণামেন্ট হয়েছিল, লড়াই থামার জন্য ১৯১৮ সালে ভোজ হয়। ঢোঁড়াই যে-দিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেদিন ১৯১৯ -এর অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে 'হাড়তাল' ছিল। সেই সময় মাস্টার সাব সরকারী চাকরি থেকে ইস্তফা দেন, 'সাভা হয়, গানহীবাবার বার্তা এসে পৌছয়। মদের দোকানে পিকেটিং হয়। কুয়রোর উপর 'গানহীবাবার' আর্বিভাব হয়, মাঝে মাঝেই শোনা যায় বাল্যবিবাহ নিরোধক সর্দা আইনের কথা। ১৯৩১ সালে আদমশুমারী। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্প বিসকন্ধা গ্রামকে তছনছ করে দিয়ে যায়। নতুন আইন অনুসারে 'বোট' বা ভোটের বার্তা নিয়ে ইতিমধ্যে গ্রামে এসে হাজির হয় মহাৎমাজীর বলন্টিয়াররা। কাংগ্রিস সরকার নতুন ভূমি সংক্রান্ত আইন পাস করায়। কিন্তু তারপরে কাংগ্রিস সরকার গদিত্যাগ করে, যুদ্ধ এসে যায়। কোয়েরীটোলাতেও একদিন বলন্টিয়ারের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রাহের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আসে বিয়াল্লিসের আন্দোলনের খবর। মহাৎমাজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ এসে যায়। বিসকান্ধার লোকেরা শপথ নেয়, 'এক বাপ, এক বাত।' থানাতে সুরাজ হয়ে গেল। ঢোঁড়াই আজাদ দস্তায় যোগ দেয়। উপন্যাস শেষ হয় তখন যখন ব্যক্তি- জীবনের নিঃসীম রিক্ততায়, রাজনৈতিক জীবনের ব্যর্থ হতাশায় ঢোঁড়াই কাছারিতে সারেন্ডার করতে এগোয়। এইভাবে, ত্রিশ বছরের কিছু বেশি সময়ের পরিধির মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তি- ও সমাজের বিবর্তনকে জিরানিয়ার দর্পনে বিম্বিত করেছেন সতীনাথ।

এই বস্তুজগতের সমগ্রতার সঙ্গে ঢোঁড়াইচরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'। সতীনাথের অসামান্য লেখন দক্ষতায় ঢোঁড়াই হয়ে উঠেছে গণনায়ক জীর্ণারন্য পেয়েছে ভারতবর্ষের মতো ভূখন্ডের পূর্ণরূপ। ঢোঁড়াই ও তার সমাজের মানুষের বদলে যাওয়ার স্বরূপ, অভিজ্ঞতা সঞ্জাত অধিকারবোধ, তাদের রামায়নের প্রতি তথা সত্যের প্রতি আত্মস্থ ভাব, গভীর বিশ্বাসবোধ পাঠককে এমন একটা জায়গায় উপনীত করে যেখানে স্থান কাল অনুভূতিতে কেবলই প্রতিভাস হয় ব্যাপ্তি আর বিশালতা।

স্বাভাবিক ভাবেই এরপর আসে মহাকাব্যের নায়কের কথা। ঢোঁড়াই আদৌ মহাকাব্যের সুর বা সুরস্থানীয় নয়। ওটি সাধারন রক্ত মাংসের মানুষ, একান্তভাবেই উপন্যাসের চরিত্র জন্ম পরিচয় থাকলেও পিতৃহীন মাতৃ পরিত্যক্ত। ঢোঁড়াই-এর মধ্যে ঘটেছে নায়কের বিকাশ, যাকে অবলম্বন করে বিধৃত হয়েছে ভারতবর্ষের এক বিপুল পরিবর্তনের কাহিনী। এই নায়কের নৈতিক চেতনা, সহজাত ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব দৃঢ়তা ও সরল সাধুতা ভুলিয়ে দেয় তার জন্মের সামান্যতা। এক প্রধান কাহিনী ও নায়ককে অবলম্বন করে কত মানুষ, কত অজস্র মানুষ, নায়কের জীবনের এক এক কান্ডে তারা আবির্ভূত হয়, আবার তারা মিলিয়ে যায়। বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র কাহিনী, নানা রসের সমাবেশ। সব মিলিয়ে পেয়ে যাই জীবন সম্বন্ধে এক প্রচ্ছন্ন গূঢ়-গম্ভীর আস্থাশীলতা, এক অবিকল প্রশান্তির প্রান্তে আমরা পৌঁছে যাই। এই এক আধুনিক মহাকাব্যের স্বাদ পাইয়ে দেন লেখক। ঢোঁড়াই হয়ে উঠেছে মহাকাব্যের নায়কের মতো - মহানায়ক, লেখপ লেখকের বাসনায় রামচন্দ্র - সত্য আদর্শের প্রতীক। সাধারন ঢোঁড়াই থেকে রামায়নজীতে রূপান্তরিত হওয়ার পথেই সে অর্জন করেছে মহাকাব্যের, বিশেষত ট্র্যাজেডির নায়কের মত সার্থকতা।

মহাকাব্যের নায়ক অসাধারন। কোন ক্ষুদ্রতা, নীচতা দ্বারা এই চরিত্র খন্ডিত নয়। এই ধরনের চরিত্রে একই সঙ্গে ঘটে থাকে বীরত্ব ও ঔদার্যের সমাবেশ। ঢোঁড়াই - এই অর্থে নিশ্চই অসাধারন - তার প্রতিবাদের সাহসও শক্তি সেই সঙ্গে স্বার্থত্যাগের মহিমা ছড়িয়ে আছে উপন্যাসের পাতায় পাতায়। মাণবিক প্রেমে সে তুলনাহীন - তাই বড়কা মাঝিকেও লোহা মানতে হয় তার কাছে যখন গুটি পোকার বাক্সগুলি বাইরে রেখে রেশম কুঠি দহনের কাজে এগিয়ে যায় ঢোঁড়াই। জীব প্রেমের এমন সজীব উদাহরন আর কোথায় আছে!

বিশ্বাসে আদর্শে মহত্ত্বে ঢোঁড়াই সত্যিই মহৎ - রামায়ুনের প্রতি, সত্যের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি তার অবিচল বিশ্বাস তাকে একের পর এক বাধা অতিক্রমের পথে শক্তি দিয়েছে। সে বিশ্বাস করেছিল মানুষকে। বোঝেনি রাজনীতির কুটিল চক্রগুলিকে। সে শুধু বুঝেছিল অন্যায় শোষন আর পীড়ন থেকে উদ্ধারের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। বার বার ঠকে গিয়েছে, পরাজিত হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকেই অর্জন করেছে নতুন করে বাঁচবার জন্য সংগ্রামের শক্তি। নৈতিক চেতনায় সে সরল অকপট ও দৃঢ়।

মহাকাব্যে মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। মহৎভাব মানবমনকে আলোড়িত করে এবং এর আবেদন সার্বজনীন। ঢোঁড়াইয়ের সামাজিক চেতনার উন্মেষের প্রতিটি পর্ব রামায়নী ফ্রেমে গ্রথিত। রামায়নের রাম যেমন একটা গোটা জাতির ভাবাদর্শের প্রতিনিধি, সতীনাথ তেমনি চেয়েছিলেন ঢোঁড়াইকে এমনভাবে রূপান্তরিত করতে যাতে সে সারা দেশের সাধারন লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাই ঢোঁড়াই শুধু তাৎমাটুলির ঢোঁড়াই, বৌকা বাওয়া আর রামিয়ার ঢোঁড়াই হয়েই শেষ হয়নি। তাকে তার চারিত্রিক মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য হতে হয়েছে 'সকলের'। তাই সে ছেড়েছে তাৎমাটুলি, বাওয়াকে, রামিয়াকে। পক্ষান্তরে ঢোঁড়াইকে ব্যাপক জীবনের মাঝে আনতে একে একে ছেড়ে গেছে কোন না কোন সূত্র রচনা করে। ঢোঁড়াইকে আনতে হয়েছে 'মাটির কাছাকাছি' মাটি সংলগ্ন মানুষের কাছাকাছি, দেশপ্রেমের বৃহৎ আদর্শে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিম্বা আরো শেষে শ্রেণীভেদহীন, জাতপাতহীন কারাগারে। এই সমস্ত পরিবেশে বিচিত্র পরিস্থিতিতে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমেই তার মধ্যে মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে হয়ে উঠেছে জীবন প্রেমিক।

মহাকাব্য যেমন, মহাকাব্যোপম উপন্যাসেও নৈতিক চেতনা শিল্পকর্মের সঙ্গে এক হয়ে প্রকাশিত হয়। তাই তার ভাষাও হয় তাৎপর্যময়। ঢোঁড়াইচরিত মানসের ভাষার মধ্যেও রয়েছে বিশালতার স্পর্শ। অঞ্চল বিশেষের লোকভাষা লোকজীবনের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের জনজীবনকে একত্রিত করেছে এই উপন্যাসে। এ ভাষার লৌকিক মাধুর্য 'রামচরিত মানসে'র উদ্ধৃতি উপমার স্পর্শে সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছে।

লোকসাহিত্যে, মহাকাব্যে কোনো একজন কবির কথা থাকে না। বহু যুগ ধরে সঞ্চিত বহু মানুষের অভিজ্ঞতা, - উপলব্ধির ছাপ থাকে তাতে। তুলসীদাসের রামচরিত মানসে এই রকম তীক্ষ্ণাগ্র বহু-অভিজ্ঞতা সঞ্জাত, সংহত বচন অনেক আছে। আমরা লক্ষ করেছি, ঢোঁড়াইচরিত মানসের আদি অন্ত ব্যেপে সতীনাথ এই রকম রচন মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিয়ে একটা বিশেষ ভাব পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, যে সব মানুষদের তিনি এনেছেন উপন্যাসে, তাদের মুখের কথাগুলোকে তিনি এই রকমই অর্থঘন তীক্ষ্ণতা দিয়েছেন। এই রকম কয়েকটি বাক্য সামনে আনছি :

'এক গাছের বাকল কি অন্য গাছে জোড়া লাগে ?'

'সব বেলনায় বেলা আছে আমার'

'আগে লেজ তুলে দেখ এঁড়ে কি বকনা, তবে না কিনবি।' ইত্যাদি

'ঢোঁড়াইচরিত মানস' মানুষ প্রধান, সেই সব মানুষকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাস হয়েছে, উপাখ্যান - প্রধান, আর প্রত্যেকটি, উপাখ্যান বর্ণনাপ্রধান এবং সর্বোপরি প্রত্যেকটি বর্ণনা দৃশ্য-গন্ধ-স্পর্শের বিচিত্র ঐশ্বর্যেসমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে, সৈয়দ মুজতবা আলীর মন্তব্য স্মরণীয় - 'এ রকম ঠাস বুনোটের বই বিদেশী ভাষাতেও তিনি পড়েছেন অল্প'। কিছু উদাহরন দেওয়া যাক -

বৌকা বাওয়ার মা মারা যাবার ঘটনা : 'মায়ের আধবোজা চোখের কোন থেকে যে জলের ধারা গড়িয়ে পড়েছিল, সেটাকে মুছিয়ে দিয়েছিল লেঙটের খুট খুলে নিয়ে। ঠোঁটের কোনের ছোট লাল পিঁপড়েটাকে দু আঙুল দিয়ে খুঁটে তুলে দূরে ফেলে দিয়েছিল - মেরে ফেলতে মন সরেনি।'

বর্ণনাটি আশ্চর্য সুন্দর। আধ-বোজা চোখ, জলের ধারা মুমূর্ষর চিত্রকে পরিস্ফুট করেছেই, ওটাকে চরমতা দিয়েছে পিঁপড়ে খুঁটে ফেলে দেওয়ার ব্যাপার। সমস্তটাই বৌকা বাওয়ার উপলব্ধিতে দেখানো - প্রাণের প্রতি ভালোবাসা, সযত্ন পরিচর্যা শুধু তারই নয়, সতীনাথেরও।

ঢোঁড়াইয়ের গানের বর্ণনা : 'বুকের জোর আছে ছোঁড়াটার। গানের শেষে বটেশ্বিয়ার আ-টা যা ছেড়েছে একেবারে ভাইচেরমেন সাহেবের দারোয়ানের কুঠরির জানলা খুলিয়ে ছেড়েছে।'

এ বর্ণনায় শব্দ দৃশ্য একই সঙ্গে মিশে গেছে সংহত। এও বৌকা বাওয়ার সকৌতুক সস্নেহ দৃষ্টির মাধ্যমে উদ্ভাসিত। বর্ণনায় অতিশয়োক্তি মনীষি শিল্পীরা সাধারণত পরিহার করেন, কিন্তু সুনিপুন প্রয়োগে এখানে তা কী রকম ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষতার সৃষ্টি করছে, তা দেখা যাক -

'সর্বনের পাতার গন্ধের চাইতেও তার ভাল লাগে, বাওয়ার জটার গন্ধটা, ঘুঁটের ছাইয়ের চাইতেও ভালো গন্ধ, হাওয়া-গাড়ির ধোঁয়ার গন্ধটার চাইতেও ভালো' - এই ভাবনাটি ঢোঁড়াই-এর, যখন সে তাৎমাটুলি থেকে কফচ্যুত হয়ে বিসকান্ধায় গিয়ে ঠেকেছে। স্মৃতিসূত্রে আহৃত উপমানগুলি অতিশয় গ্রোজ্জ্বল, কত বিচিত্র রঙ আর অনুভূতি। গন্ধ বর্ণ দৃশ্যের বিচিত্র সমপাত। সর্বোপরি ঢোঁড়াই-এর জীবনচর্যা থেকেই সেগুলি আহৃত, লেখকের জীবনচর্যা থেকে নয়।

ঢোঁড়াইচরিতে'র পাতায় পাতায় এমন সমৃদ্ধ বর্ণনা রাশি রাশি ছড়িয়ে রয়েছে। আর একটি অনন্য উদাহরণ নেওয়া যাক - রামিয়াকে ঢোঁড়াই-এর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে ষড়যন্ত্র করেছে তাৎমাদের 'পঞ্চায়তি' এবং নারী লোলুপ সামুয়ার। সেটা বুঝতে পেরে ঢোঁড়াই-এর কী প্রতিক্রিয়া হল, তার বর্ণনা করেছেন সতীনাথ। 'টাকা খেয়ে সাজস করেছে শালা চোটার দল।' গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ওঠে ঢোঁড়াই। তার হিংস্র চোখের মধ্যে দিয়ে ঠিকরে পড়ছে অজস্র বজ্রের স্ফুলিঙ্গ। 'বজরঙ্গবলী' মহাবীরজীর অসীম শক্তি এসে গিয়েছে তার দেহে আর বাহুতে। অনেক বড় দেখাচ্ছে তাকে। সমুখের এই 'হফৎরঙ্গী' পিঁপড়েগুলোকে সে ফুঁ দিয়ে ছত্রাকার করে দিতে পারে মুহূর্তের মধ্যে, টেনে ফেলে দিতে পারে দূরে যেখানে ইচ্ছে, ঝড়ের মুখে বকরহাটার মাঠের শিমুল তুলোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে এক নিঃশ্বাসে, পড় পড় করে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে ঐ

কুত্তা সামুয়রটাকে -, কী করে কখন সে মহন্তোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, তা সে নিজেই জানতে পারেনা। সারা পৃথিবী তার চোখের সম্মুখ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে পশ্চিমা সাপটাকে সে পুষেছিল সেটা এতদিনে ছোবল মেরেছে। .... পৃথিবীতে আগুন লেগে গিয়েছে - কাঁপছে ঘুরপাক খাচ্ছে, ধসে যাচ্ছে পায়ের নীচের মাটি। .... যাক্ কিন্তু কারও শক্তি নেই সেই সাপটার কাছে যাবার পথে তাকে বাধা দেয়, মহাবীরজীও না, গোঁসাইও না, খোদ রামচন্দ্রজী এলেও না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হাওয়া শান্ত হয়ে গিয়েছে, তার প্রতিটি স্নায়ুর উদ্দণ্ড আলোড়ন দেখে। তার হাত মুঠো হয়ে আসছে, প্রচণ্ড শক্তিতে পৃথিবীকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারে এখনই, এর প্রতিটি অনু পরমাণু তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে সারাজীবন। ...."

এ বর্ণনা মহাকাব্যেই মেলে। এর অতিশয়োক্তি ঢোঁড়াই-এর স্ফীত, ক্রুদ্ধ অন্তরকে ফুটিয়ে তুলছে। অস্তিত্ব কনা যে অমিত সম্ভাবনাময় এর মধ্য দিয়েও তাকে প্রকাশ করা হল।

মহাকাব্যের চরিত্রগুলির প্রাণ নাটকীয় ভাব ব্যঞ্জণায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসে নাটকীয় চমৎকারিত্ব বার বার সৃষ্টি হয়েছে, ফলে একের পর এক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও প্রকটতর হয়েছে। আর তারই তীব্র দ্বন্দ্বে নায়ক আলোড়িত, ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। ঢোঁড়াইয়ের পাক্কীতে কাজ নেওয়ার ফলে থান জ্বালানো, গান্ধীর মুরত দর্শনে নাটকীয় উত্তেজনা, রামিয়ার প্রতি আকর্ষণ - বিবাহ ও বিচ্ছেদে নাটকীয় ভাবাবেগ, দ্বিতীয় চরণে ধানের গোলা আক্রমণ, ভুমিকম্পের ঘটনা, সাগিয়ার অন্তর্ধান, সতিগিরিয়া উৎসব, তিতলিকুঠি দহন, আজাদদস্তার জীবন, এন্টনির আবির্ভাব ও সুর্ণসীতার আকর্ষনে ঢোঁড়াইয়ের জীবনের চরম পরিণতি নিঃসন্দেহে নাটকীয় জীবনচর্যার পরিচায়ক।

সবশেষে আসে মহাকাব্যের রসের কথা। মহাকাব্যের অঙ্গীরস - বীররসাত্মক। সংগ্রাম মুখর ঢোঁড়াইচরিতে এই রস সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আনুষঙ্গিক রসাবেদন ও সৃষ্টি হয়েছে সেই সঙ্গে শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য ইত্যাদি সহযোগে। কিন্তু মহাকাব্যের মুল রস -

বিশাল রস, রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রসকে মহাকাব্যের প্রাণ বলেছেন। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' পড়তে পড়তে পাঠকমনে মহত্ববোধ জাগে বিরাট বস্তুকে আশ্রয় করে - তার ভিত্তি সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। সাধারন মানুষ ঢোঁড়াই শেষ পর্যন্ত সত্য ও ন্যায় রক্ষা করতে গিয়ে শূন্যতার মধ্যে নিজেকে সমর্পন করেছে তা পাঠককে নিশ্চই বিস্ময়াভিভূত ও শ্রদ্ধাবনত করে।

কিন্তু মহাকাব্যের পরিণতি শান্ত রসপ্রবাহে। চরম দুঃখের কারুণ্যে, শূন্যতার গর্ভে নিমজ্জিত, বিশ্বাসের শেষ বিন্দু রামায়ন খানার প্রতিও যার প্রয়োজন ফুরিয়েছে এমন হতভাগ্য মহৎ নায়কের প্রতি রুদ্ধ - রোদনা বেগে পাঠক চিত্ত হয় বিমূঢ় স্তব্ধ। সর্বরিক্ত ঢোঁড়াই নিঃসঙ্গ যুগমানসের মত প্রতিনিধির মতো একা দাঁড়িয়ে তার প্রিয় পরিচিত অথচ চির অপরিচিত পাকুরীর ওপর - দূরের ইশারা নিয়ে সামনে অনন্ত মহাপ্রস্থানের পথের মতো পড়ে আছে পাকুরী। সমস্ত রূঢ়তা ক্রূরতা, তামসিকতা, রাজসিকতা ও বহু অশুর শেষে ঢোঁড়াই, চিরসংগ্রাম মুখর অথচ চিরপরাজিত মহানায়ক এগিয়ে চলেছে সেই পথ ধরেই। এই ভাবেই দেশ-কাল ও মানুষ নিয়ে লিখিত হয়ে যায় এক আধুনিক এপিক - এক আধুনিক রামকথা।

'ময়লা আঁচল' উপন্যাসে মহাকাব্যের লক্ষণ ও ফণীশ্বর নাথ রেণুর উপন্যাস ও শিল্পরীতি।

'ময়লা আঁচল' উপন্যাসে মহাকাব্যের লক্ষণ একেবারে অলক্ষণীয় নয় তবে ঢোঁড়াই-চরিত মানসের সাথে তার পার্থক্য আছে। হিন্দী সাহিত্য সমালোচক শিবদান সিংহ চৌহান বলেছেন - 'ময়লা আঁচল মুক্তিউত্তর ভারতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য (দ্রঃ প্রস্তাবনা, ময়লা আঁচল : অনুবাদ : প্রসুনমিত্র, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, ১৯৭৫)। বদরী নারায়ন সিংহা বলেছেন - 'মৈলা আঁচল কো ন্যায়নে যুগকা মহাকাব্য কহা ন্যায়'।[১৫]

সতীনাথ ভাদুড়ীর মতো অতো বেশী না হলেও রেণুও তাঁর ডায়েরীতে উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করতেন। বিশেষ করে তাঁর আত্মকথামূলক রচনাগুলিতে উপন্যাস রচনার নানা উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। রেণুর প্রথম উপন্যাস 'ময়লা আঁচল'।

১৯৪৫-৪৪ পর্যন্ত ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলের গদ্ধে হাউসে এর সূত্রপাত (জেলের রাজবন্দীদের গঠিত গল্পসভা, যেখানে পালা করে সবাইকে গল্প বলতে হত। এই গদ্ধে হাউসেই ময়লা আঁচল রচনার সূত্রপাত।) এ উপন্যাসের প্রকাশ ১৯৫৪। ১৯৪৫-র পর থেকে নানা ঘটনা অতিক্রম করে রেণু এই উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর আত্মকথামূলক রচনা - 'অপনী কথা' (এক শ্রাবনী দোপহরী কা ধূপ, পৃ: ৩২) টুটতে-বিখরতে সপনো কী দাস্তান (শ্রুত-অশ্রুত পূর্ব, পৃ: ৩৬-১৪১) 'জন জাগরন মে সাহিত্যকার কী ভূমিকা' (শ্রুত-অশ্রুতপূর্ব পৃ: ১৩১) ইত্যাদি রচনায় এই উপন্যাস রচনার নানা প্রসঙ্গের অবতারনা করেছেন রেণু। রেণুর একদা রাজনৈতিক সহকর্মী ডা: রামবচন রায় রেণুর এই রচনা সম্পর্কে লিখেছেন ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলের গদ্ধে হাউসে রেণুর মুখে-মুখে শোনানো গল্পটি কিভাবে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ময়লা আঁচলে পরিণত হয়েছিল। ...:"রেণুকে মন মে জিতনী কহানীয়া বনী ওয়ে সব কাগজ পর নহী আ সকী। উনকে, পরিচিত আউর মিত্র জানতে হ্যায় কি কিতনা রস লেকর উন কহানিয়োঁ কো সুনাতে থে রেণু। কহানী জোড়নে আউর গড়নে মে ওয়ে মাহির থে। এ্যায়সী হী এক কল্পিত কহানী উন্হোনে জেল মে সুনাই থী জো বাদমে 'মৈলা আঁচল' কী কথা-বস্তু বনী"।[১৬] এই সব রচনা-গুলিতে উপন্যাসটির কথা বস্তু, চরিত্র-পরিবেশ - বিভিন্ন ঘটনার উৎস মেলে। কিন্তু উপন্যাসটি কিভাবে লেখা তার গঠন শৈলী কি হবে তেমন কোনো ভাবনামূলক রচনা পাওয়া যায় না।

কোন মহাকাব্যের আদলে 'ময়লা আঁচল' গড়া নয়। কিন্তু আমরা "প্রাচীন এপিকেরই আধুনিক প্রতিভূ উপন্যাস। ..... এপিকের লক্ষণ বস্তু সমগ্রতা, যেমন নাটকের লক্ষন সংঘাতের সমগ্রতা, রেণুর 'ময়লা আঁচল' এক পরিবেশ প্রধান-বস্তুনিষ্ঠ আধুনিক মহাকাব্য। মেরীগঞ্জের অধিবাসীদের জীবনের আপাত তুচ্ছ ঘটনাগুলো সাজিয়ে যে সমগ্রতার সৃষ্টি রেণু করেছেন, তা 'ময়লা আঁচলে' বস্তু সমগ্রতায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

রামায়ণের আদলে সতীনাথ ভাদুড়ী যে 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' লিখতে চেয়েছিলেন সেটা যেমন সরাসরি তুলসীদাসের রামচরিত মানসের প্রতিধ্বনিময় নামকরন থেকে বোঝা যায়। সেই রকম সুপরিকল্পিত ভাবে কোন মহাকাব্যের আদলে 'ময়লা আঁচল' গড়া নয়। 'ময়লা আঁচলে'র জন্য রেণু সংগীত-চিত্র-ফিল্ম-রিপোর্তাজ ইত্যাদি অনেক প্রকরণের সহায়তায় এক নতুন ফর্ম উপস্থাপন করেছিলেন - "রেণু নে অপনে পহলে হী উপন্যাস 'মৈলা আঁচল' মে আঞ্চলিক সংবেদনা কে অনোখে শিল্প (জো ইতিবৃত্ত, সংগীত, চিত্র, ফিল্ম, রিপোর্তাজ আদি অনেক শৈলিয়ো কে সংযুক্ত আকর্ষন সে নির্মিত হ্যায়) কো অবিস্কৃত কিয়া থা ....." [১৭] রেণু তাঁর এই উপন্যাসের নামকরণ সুমিত্রানন্দন পন্থের 'ভারতমাতা গ্রামবাসিনী কবিতা থেকে করেছেন ('ক্ষেতো মে ফৈলা হ্যায় শ্যামল ধূল ভরা ময়লা সা আঁচল')। ভারতমাতাকে পল্লীবাসিনী আখ্যা দিয়ে কবি বলেছেন - 'ক্ষেতে ক্ষেতে বিছিয়ে আছে শ্যামল ধূসর মলিন আঁচল।' বলা বাহুল্য সে আঁচল দেশ মাতৃকার অঞ্চলের প্রতীক কোন ক্ষুদ্র এক অঞ্চলের নয়। ময়লা আঁচলের মুখবন্ধে লেখক বলেই দিয়েছেন যে - 'মিথিলার ঐ ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামখানি কে তিনি ভারতের সমস্ত 'অনগ্রসর-গ্রামের প্রতীক' হিসেবে উপন্যাসের আখ্যানপট বেছে নিয়েছেন। যেহেতু ভারতের সমস্ত গ্রামই আজও পিছিয়ে পড়া, গোটা ভারতবর্ষই সামগ্রিকভাবে এক পিছিয়ে থাকা দেশ, কাজেই ময়লা আঁচলের মূল চরিত্র নিঃসন্দেহে সর্বভারতীয় জীবন। গোটা ভারতীয় জীবনের প্রতিনিধিত্ব করতে হলে, যে কোন উপন্যাসের আখ্যানভূমি হিসাবে নির্বাচিত করতে হবে ছোট এলাকাকেই। কিন্তু তাতেই লেখকের নিপুনতায় ধরা পড়ে তা লাভ করে মহাকাব্যের পটভূমির বিশালতা। মেরীগঞ্জের কাহিনীও বিশে সীমায় আবদ্ধ থাকেনি, তাই ঢোঁড়াইচরিত মানসের জিরানিয়ার মত 'মেরিগঞ্জে'র জীবনও হতে পেরেছে অনুভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি। এই দুই উপন্যাসের কাহিনী সারা ভারতের প্রেক্ষাপটে বিস্তার লাভ করেছে। এই দুটি উপন্যাসে যে বক্তব্যগুলি পরিবেশিত হয়েছে তা কোন নির্দিষ্ট গ্রামের নয়, ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রাম জীবনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

'ময়লা আঁচলে' কোন আঙ্গিকারিক কথা বা মূল কাহিনী নেই। নেই কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে সতীনাথ ঢোঁড়াই এ একটা প্রোটোটাইপ ব্যবহার করেছিলেন। 'ময়লা আঁচলে'র মেরীগঞ্জ গ্রামই যেন কেন্দ্রীয় চরিত্র। এই গ্রামের বিভিন্ন পাত্র পাত্রীর জীবন চিত্র মেরীগঞ্জের সমূহ রূপ প্রকাশ করেছে। ভিন্ন কাহিনী নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র চলচ্চিত্রের মত আসে যায়। কিন্তু সব কিছুই 'মেরীগঞ্জের সূত্রে আবদ্ধ - 'মৈলা আঁচল এক কথাসাগর বন গয়া হ্যায়, জৈসে সাগর মে বিভিন্ন স্রোতো সে আয়া হুয়া জল মিলকর এক রূপ হো জাতা হ্যায় উসী তরহ এক হী অঞ্চল ইয়া গাঁও-সাগর মে ইয়ে বিভিন্ন কহানী-নদীয়া বিলীন হো জাতী হ্যায়। জৈসে সাগর সংগ্রহ নহী ঐসে হী ইহ উপন্যাস কথা সংগ্রহ নহী' ..... সভী কহানীয়া অঞ্চল সূত্র সে বন্ধ হ্যায়।"[১৮] উপন্যাসের কোন প্রসঙ্গ - ঘটনা বা পাত্র-পাত্রী বেশীক্ষন সময় পাঠকের সামনে থাকেনা। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি নাটকীয় চমৎকারিত্ব বার বার সৃষ্টি করেছে, ফলে একের পর এক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও প্রকটতর হয়েছে।

ক) রেণুর উপন্যাসে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি উপস্থিত হয় অপসৃত হয়। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনীর দ্রুত পরিবর্তন হয়, অনেকটা চলচ্চিত্রের মত। রেণুর প্রথম দুটি উপন্যাসেই কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই, 'ময়লা আঁচল ও পরতি পরিকথা'য় অঞ্চলই কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্থান নিয়েছে। যে প্রসঙ্গ-ঘটনা উপন্যাসে এসেছে তা সেই অঞ্চলের কোন না কোন বিশেষত্ব কে উদ্ঘাটন করেছে।

খ) অঞ্চলে মানব রূপ পরিব্যাপ্ত হয়েছে উপন্যাসে। অঞ্চল উপন্যাসের আদি-মধ্য-অন্তে এসেছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ অঞ্চলের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। অঞ্চলকে সজীব করবার জন্য লোক সংস্কৃতির সাহায্য নিয়েছেন। পরম্পরাগত ব্যবহার, বিশ্বাস-রীতি-রেওয়াজ এর উপর রেণু গুরুত্ব দিয়েছেন।

গ) উপন্যাসে একাধিক চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী কিন্তু এই চরিত্রগুলি পরস্পর এক অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। অঞ্চলের আঙ্গিক রূপ উদ্ঘাটনে এই চরিত্রগুলি মূল কাহিনীতে অংশ নিয়েছে।

ঘ) রেণুর উপন্যাসের বস্তুবিন্যাসে লেখকের পূর্বস্মৃতি, ডায়রী, রিপোর্তাজ বিভিন্ন প্রসঙ্গ বর্ণনায় ও চরিত্র নির্মানে সহায়তা করেছে।

রেণু তাঁর উপন্যাস রচনায় নিজস্ব শৈলী সৃষ্টি করেছেন। বর্ণনাত্মক শৈলী নিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এনেছেন নবীনত্ব। রেণু উপন্যাসের চরিত্র-ঘটনা কোন কিছুর সরাসরি বর্ণনা দেন না। চরিত্র বা ঘটনাগুলি নিজ নিজ কেন্দ্রে অবস্থিত থেকে একই অঞ্চলের তথা পটভূমিকায় বৃত্তাকারে পরিবেশিত হয়। চরিত্র বা ঘটনার বিকাশ কখনো সরলরেখার মত হয়না, চরিত্রগুলি আসে আবার মিলিয়ে যায়। ছোট-ছোট ঘটনা চরিত্রগুলির স্থিতিও স্বল্প। পরিবেশ বা পটভূমির বিস্তার করেই তারা সরে যায়। লেখক এক সাথে অনেক ঘটনা, চরিত্র সহ এগোতে থাকেন। এই সব চরিত্রের অন্তর্বিরোধ, বিভিন্ন মূল্যবোধ, কখনো সাংকেতিকতায় সর্বোপরি নাটকীয়তায়, লেখকের ব্যঙ্গাত্মকতায় লেখকের নিজস্ব চরিত্র বিন্যাস পদ্ধতি অনুভব করা যায়।

রেণু স্বল্প পরিসরে অদ্ভুত কুশলতার সঙ্গে বহু চরিত্র এক সঙ্গে উপস্থিত করে পরিস্থিতির জটিল চিত্র অংকন করেছেন। লেখক যেন, পর্দার আড়াল থেকে তাদের আচার-আচরনের মধ্য দিয়ে তাদের চরিত্র প্রকাশ করেছেন।

'ময়লা আঁচলে'র প্রথম অধ্যায়টি থেকে দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে - মেরীগঞ্জ গ্রামে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্মচারীদের ম্যালেরিয়া সেন্টার খুলতে আসবার ঘটনা নাটকীয় বক্রতা দিয়ে গ্রাম ও গ্রামবাসীদের আশ্চর্য্য সংবেদনাত্মক ও সমস্যাত্মক যথার্থতা অংকন করেছে। চলচ্চিত্রের মত ঘটনাটি এসেছে - প্রথমে মেরীগঞ্জ গ্রামের ভৌগোলিক পরিচয়ের সাথে ম্যালেরিয়া সেন্টার খুলবার ইতিহাসটুকু বিধৃত করে চকিতে ঘটনার স্রোত বয়ে যায়- মিলিটারীরা বহরা চেথরুকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। লোবিন লালের কুয়া থেকে বাল্টি খুলে নিয়ে গিয়েছে ..... যাদব টোলীর মানুষরা খবর শুনে বলদেবকে

বেঁধে নিয়ে চলল। প্রথম পৃষ্ঠাতেই যে চরিত্রগুলি পাচ্ছি তারা, বহরা চেথরু, মুসহরু, মুসহরুর শ্বশুর, শ্বশুরের ভাতীজা, ফারবিস সাহেব, বালিয়া, তহসীলদার বিশ্বনাথ প্রসাদ, ছিরুক্রী দাস, লোবিন দাস, রামকৃপাল সিং, মোদী, মোদীর মেয়ে ইত্যাদি ছাড়াও যারা কাহিনীর ক্রমবিকাশে আসেন এরকম বহু চরিত্রের ভীড় এই উপন্যাসের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রগুলি হল, - ডাঃ প্রশান্ত, বালদেব, বিশ্বনাথ প্রসাদ, জোতখীজী, রামদাস, প্যারু, সুমরিত দাস, রামকৃপাল সিং, খেলাওন সিং যাদব, কালীচরণ, বাওন দাস, মহন্ত সেবাদাস, চলিত্তর কর্মকার, লছমী, ফুলিয়া, কমলা, মঙ্গলা, রামপিয়ারী, মমতা। এরা কেউই 'ঢোঁড়াই'এর মত ক্লাসিক চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। মহাকাব্যের নায়কের মত ঢোঁড়াই চরিত্রের ক্রমবিকাশ হয়েছে, এদের মধ্যে সে রকম কোন ক্রমবিকাশ নেই। এই সব কারনেই হিন্দী সাহিত্য সমালোচক নেমিচন্দ্র জৈন বলেছেন ময়লা আঁচলের কোন চরিত্রকেই ক্লাসিক বলা যায় না, যে অর্থে প্রেমচন্দের 'গোদান'র হোরী বা ধনিয়াকে বলা যায় - "নেমিচন্দ্র জৈন নে সংকেত কিয়া হ্যায় 'মৈলা আঁচল'কে কিসী ভী পাত্র কো উস অর্থ মে 'ক্লাসিক' নহী কহা জা সকতা জিস অর্থ মে হোরী, ধনিয়া, শেখর ইয়া মৃনাল কো, পর কহনা না হোগা কি মৈলা আঁচল কে পাত্র অপনী লঘুতা ইয়া সামান্যতা মে ভী উল্লেখ্য আউর এক হদ তক অবিস্মরণীয় হ্যায়। আউর তো আউর, 'মেরীগঞ্জ' কা হী এক অবিস্মরণীয় চরিত্র হ্যায় - সারে কলহ আউর সংঘর্ষ কে বীচ মানবীয় আউর মার্মিক। শিল্প কী নবীনতা কী দৃষ্টি সে বিচার করনা চাহে তো বিল্কুল স্বাভাবিক ঢংগ সে কই কলা মাধ্যমো আউর পধ্ধতিয়ো কা চিত্র মন মে উভরনে লগেগা জিনকে সংযুক্ত প্রয়োগ সে বিখরাও কী একতা ইয়া ঘনিষ্ঠতা কা এক সতর্ক কৌশল ইস উপন্যাস কে ঢোঁচে মে ব্যাক্ত হুআ হ্যায়।"[১১]

'ময়লা আঁচলে' কোন আধিকারিক কথা, কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই সে কথা বলেছি, ময়লা আঁচলে মেরীগঞ্জের গ্রামের, গ্রামবাসীদের জীবনের যে চিত্র আমরা পাই তা ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামের - ভূমিহীন, ভূমিবুভুক্ষ, ভূমিলোভী ও ভূমধ্যিকারীদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বাঁচার চেষ্টার যে সমগ্রতা তা অসামান্য শিল্প রূপ পেয়ে

যায়। এই বাঁচার চেষ্টা, এই জীবনই মহাকাব্যের উত্তরাধিকারী উপন্যাসের কথাবস্তু। জনতার নৈতিক অভ্যুত্থান এর ভাববস্তু। এই উপন্যাসে আছে বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র মানসিকতার নানাধরনের নরনারী। এদের কাহিনীকে গোপাল হালদারের ভাষায় - ঢোঁড়াইচরিত মানসে'র মত ময়লা আঁচলকেও বলা যায় 'সত্যিকারের discovery of India এবং Epic of the unknown India."

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পূর্বকাল, গান্ধীজীর নেতৃত্বে জন জাগরন, কৃষক-শ্রমজীবিদের মানুষ নব্য চেতনা, সমাজবাদী চিন্তার অগ্রসর, স্বাধীনতা লাভ, গান্ধী হত্যা দেশবিভাগ ইত্যাদির মধ্যে মেরীগঞ্জের মানুষদের সমাজের বদলে যাওয়ার স্বরূপ, তাদের অধিকারবোধ সমস্ত, মেরীগঞ্জ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মানুষের কাহিনীকে এক জায়গায় উপনীত করে রেণু এই উপন্যাসে এনেছেন মহাকাব্যের প্রতিভাস।

ঢোঁড়াইচরিত মানসে ব্যক্তি ও সমাজের পরিবর্তনশীলতাকে রূপায়িত করবার জন্য সতীনাথ ভেবেছিলেন - 'রামায়ন মহাভারতে কত উপাখ্যান যেমন মূল কাহিনীর সঙ্গে আলগা ভাবে গাঁথা সেইরকমভাবে লিখলে দেখলাম আমার কাজ চলতে পারে।' রেণুর উপন্যাসে মেরীগঞ্জ যেন মূলকেন্দ্র, তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কাহিনী সংযবদ্ধ হয়েছে। অনু ভারতবর্ষ আর অনেক মানুষ এই হলো দুই উপন্যাসের উপাদান। এক স্থানু সমাজ অর্থনৈতিক অভিঘাতে ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ধীরে ধীরে নিঃচেতনার নির্মোক খসিয়ে চলমান হতে শুরু করেছে। 'ময়লা আঁচলে' - অজস্র মানুষ উপন্যাসের এক এক কান্ডে আবির্ভূত হয়েছে, আবার মিলিয়ে গিয়েছে। বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র কাহিনী, নানা রসের সমাবেশ, সব মিলিয়ে যেন এক বিরাট জীবনের অজস্র চিত্র। যার মধ্যে আধুনিক মহাকাব্যের আস্বাদ পাইয়ে দেন লেখক।

'ঢোঁড়াইচরিত মানস' উপন্যাসের প্রথম চরণে সতীনাথ তাৎমাটোলীর জীবন বর্ণনা করেছেন। এই তাৎমারা চাষবাস করেনা, বাসের জমি ছাড়া জমি চায়না। কিন্তু সতীনাথ

বুঝেছিলেন চাষবাসের বিবরণ ব্যতীত ভারতবর্ষকে প্রতিবিম্বিত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে চোঁড়াইকে স্থানান্তরিত করেছেন জমি ও চাষের রাজ্যে বিসকাশ্ধায়। নিজেই লিখেছিলেন সতীনাথ - 'আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক যা চাষবাস করে খায়। তাই গোরুর-গাড়ির চালক চোঁড়াইকে যৌবনে তাৎঘাটুলি থেকে সরাতে হল চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার জন্য।' বিসকাশ্ধার এই পর্বের সাথেই ময়লা আঁচলের সাদৃশ্য বেশী।

'ময়লা আঁচল' পুরোটাই জমির গল্প। এখানকার মানুষদের হাসিকান্না, রঙ্গ-তামাশা, সবই চাষবাস আর ভূস্বামীদের নিয়ে। ভারতবর্ষের মানুষদের জীবনে এই যে জমির বাস্তবতা তা সম্পন্ন কৃষকসন্তান রেণু খুব ভালো করে বুঝতেন। তিনি মেরীগঞ্জ অঞ্চলের মানুষদের জীবন, লোকচর্চা, লৌকিক জীবন, তাদের প্রবাদ প্রবচন, ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা, হাসি-রঙ্গ তামাশা, নীতিবোধ সংস্কার প্রথা সবই চিত্রিত করেছেন - বস্তুসত্য রূপায়নের দাবীতে। এর জন্য রেণুকেও সতীনাথের মত বস্তুনিষ্ঠার শর্ত বজায় রাখার প্রয়োজনে নিরুপায়ভাবে আঞ্চলিক লক্ষণ তুলে ধরতে হয়েছে।

ময়লা আঁচলের মেরীগঞ্জ ও পূর্ণিয়া জেলার একটি অনগ্রসর গ্রাম। অনেকদিন আগে নীলকর সাহেব মার্টিন তার নববিবাহিতা পত্নী মেরীর নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ করেছিলেন মেরীগঞ্জ। তার আগে এই গ্রামের পুরানো নাম কি ছিল তা আজ আর কারো মনে নেই। কারণ একবার পুরানো নাম মুখে আনাতে একজন গ্রামবাসী মার্টিন সাহেবের হাতে দারুনভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন। বোধ করি সেই ভয়ে পুরানো নাম কেউ মুখে আনত না। মেরী এই অঞ্চলে আসবার পর এক সপ্তাহ পরে ম্যালেরিয়া জ্বরে তার মৃত্যু হয়। মেরীর দেহ কবর দেবার পর মার্টিন সাহেব মেরীগঞ্জে ম্যালেরিয়া ডিসপেন্সারী খুলবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে বিফল মনোরথ মার্টিন সাহেবের পাগল হয়ে মৃত্যু হয়।

উপন্যাসের শুরু মেরীগঞ্জে ম্যালেরিয়া সেন্টার খুলবার সূচনা দিয়ে। সময় ১৯৪৬। মেরীগঞ্জের অধিবাসীরা এত অজ্ঞ ছিল যে ম্যালেরিয়া সেন্টারের জন্য ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড-এর জমি জরীপ করতে আসা সরকারী কর্মচারীদের মেরীগঞ্জবাসীরা মিলিটারীর লোক ভেবে বসে। ১৯৪২ এর জন আন্দোলন ঠেকাবার জন্য ইংরেজ সিপাহীদের অত্যাচারের কাহিনী লোকমুখে নানাভাবে ছড়িয়ে ছিল। তাই গ্রামের লোকেরা ভীতিগ্রস্ত থাকত। এই রকম অত্যাচারের ভয়াবহতার কথা তৎকালীন অনেক গ্রামবাসীর মনে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। এই রকম অত্যাচারের বর্ণনা 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'এ ঢোঁড়াইকে মোসম্মত(সাগিয়ার মা) দিয়েছে। কংগ্রেস কর্মী বলদেব মেরীগঞ্জ গ্রামে এসেছিল দলীয় নীতি ও কার্যক্রম প্রচার করতে। তাকে দমন করবার জন্য সম্ভবত: মিলিটারী এসেছে ভেবে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বলদেব কে বেঁধে গ্রামবাসীরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্মচারীদের কাছে নিয়ে গেল। পরে সবার ভুল ভাঙল। অদ্ভুত নাটকীয়তায় এ উপন্যাসের সূচনা। শুরুতেই গ্রামবাসীদের মানসিকতা মাত্র একটি ঘটনা দিয়ে স্পষ্ট করেছেন।

'মেরীগঞ্জ বড়ো গ্রাম। বারো বর্ণের লোক বাস। গ্রামের পুব দিকে একটা ধারা বয়ে গেছে - তার নাম কমলা নদী। বরষায় কমলা ভরা নদী। বাদ বাকি ঋতুতে বড়ো বড়ো গর্তে জল জমা হয়ে দিন থাকে। পদ্ম ফুল ছেয়ে থাকে, আর তেমনই মাছ। পৌষ পূর্ণিমার দিন সকাল থেকে সন্ধে অব্দি এই গর্তগুলোয় কোশী স্নান যাত্রীদের ভিড় লেগে থাকে। রাউতহাটের ইস্টিশান থেকে এসে ময়রারা দোকান দেয়। কমলা মাইয়ার যাহাত্তি নিয়ে গ্রামবাসীদের নানান কাহিনী আছে। .....

রাজপুত আর কায়স্থদের ভেতর ঝগড়া মনান্তর আজ পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কম, তাই তারা তৃতীয় শক্তির ভূমিকা নিয়েছে। হালে কিছুদিন হল যাদব গোষ্ঠীর ও রেশরবরবা। পৈতে নেওয়া সত্ত্বেও রাজপুতরা যদুবংশীয়দের ক্ষত্রিয় বলে মানছে না। বরং তাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নিয়ে সময় অসময়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। একবার

যদুবংশীরা খোলাখুলি ওদের চ্যালেঞ্জ জানাল, সে কথা নিয়ে ক'দিন খুব সরগরম হল। দুপক্ষেরই লোকজন তৈরী হয়েছিল ....

ইদানীং গ্রামে তিনটি দলই প্রধান। দলগুলি জাতি-ভিত্তিক - কায়স্থ, রাজপুত আর যাদব। ব্রাহ্মণরা আজো তৃতীয় শক্তি। গ্রামের অন্যজাতের বাসিন্দারা সুযোগ-সুবিধেমত ঐ প্রধান তিনদলের একটা-না-একটার সঙ্গে মিশে থাকে। কায়স্থটোলির মুখিয়া বিশ্বনাথ প্রসাদ মল্লিক রাজপার বঙ্গাঁর তশীলদার, হাজার বিঘে জমির মালিক। গাঁয়ের তিন জাতের লোক তাই কায়স্থটোলীকে বলে মালিকটোলা। খালি রাজপুতরা বলে কায়েতটোলী। কায়স্থটোলীর লোকে রাজপুত টোলীকে বলে 'সেপাইটোলী'। যাদবদের নতুন দল। তাদের মুখিয়া খেলাওন যাদবকে দশ বছর আগেও লোকে মোষ চরাতে দেখেছে ...... এখন তার দেড়শো বিঘের জোতজমা। তিনটোলীর প্রধানই জমির মালিক। গ্রামের এক প্রান্তে সাঁওতালরা থাকত। এরা জমির চাষবাসের কাজে নিযুক্ত। জমির মালিক ঐ তিন টোলীর প্রধানের কাছেই এরা বাঁধা ও পীড়িত। গোটা মেরীগঞ্জে দশজন লেখাপড়া জানা লোক আছে। লেখাপড়া মানে হল নাম সই করা থেকে নিয়ে মায় তশীলদারী করা পর্যন্ত বিদ্যে। নতুন বিদ্যার্থীদের সংখ্যা হল পনরো।"

এই হলো মেরীগঞ্জের মানুষদের মোটামুটি ছবি। মেরীগঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন টোলীর মানুষ ভিন্ন-ভিন্ন রাজনৈতিক দলদ্বারা চিহ্নিত ছিল। কোন রাজনৈতিক চেতনা নয়, বর্ণচেতনা এদের ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল।

কংগ্রেসী বালদেব যাদব সম্প্রদায়ভুক্ত তাই তার যাদবটোলীতেই প্রাধান্য বেশী। কথায়-কথায় সে 'ভারতমাতা' - 'মহাত্মা গান্ধী'- আন্দোলন-অনশন-অহিংসার কথা বলে। কিন্তু তার মধ্যেও আদর্শচ্যুতি ঘটে। লোকে তাকে বকধার্মিক বলতে শুরু করে। এরপরে সেখানে আসে বামন দাস। অসাধারন চরিত্র এইটি। প্রকৃত দেশভক্ত, স্বার্থত্যাগী। অন্যায়ের সাথে সে আপোস করেনা। অনুভব করে কংগ্রেসের রাজনীতির মধ্যে কিভাবে ঢুকে গেছে বর্ন্যাভিমান। সেখানে দেশ-আদর্শর প্রতি কারো কোন আনুগত্য

নেই। সবাই সবার সম্প্রদায় নিয়ে রাজনীতি করছে। কেউ ভূমিহার কংগ্রেসী, কেউ কায়স্থ কংগ্রেসী কেউ রাজপুত কংগ্রেসী। এই উপন্যাসের সময়কাল ১৯৪৬ থেকে গান্ধীজীর মৃত্যু পর্যন্ত। এই সময়কালের মধ্যে ভারতীয় জনতার সমূহ চেতনার ছবি ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে। গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলন সেই সঙ্গে সমাজবাদী চেতনা কিভাবে গ্রামের মানুষের মন পরিবর্তন করছিল তারও ছবি রেণু এঁকেছেন। উচ্চবর্ণের তথা রাজপুত, ব্রাহ্মণটোলীর রাজনীতির মধ্যে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের প্রভাব। তেমনি কালীচরণের মধ্যে সোসালিস্ট পার্টির প্রভাব। দলিত-অবহেলিত ভূমিহীনদের ন্যায্য প্রাপ্তি বঞ্চিত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কালীচরণ সর্বদা তৎপর। অবহেলিত-দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার, নবচেতনার প্রতীক সে। কালীচরণ রেণুর যুগচেতনার প্রতীক।

এ ছাড়াও গ্রামে আছে কবীর পন্থীদের মঠ। বৃদ্ধ অন্ধ মোহন্ত, কোঠারিন লক্ষ্মীদাসী, রামদাস ভিন্ন প্রকৃতির সব মানুষ। ধর্মের আড়ালে কিভাবে ভ্রষ্টাচার লুকানো থাকে রেণু মঠের এই সব বিভিন্ন চরিত্রদের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন।

গ্রামের অধিকাংশ জমি তিনটোলীর প্রধান বিশুনাথ প্রসাদ, রামকৃপাল সিং, রামখিলাওন যাদবের হাতে। এরাই গ্রামবাসীদের নিয়ন্ত্রন কর্তা। গ্রামের এক প্রান্তে সাঁওতালরা চিরকাল অবহেলিত। কালীচরণ যখন তাদের কাছে সোসালিস্ট পার্টির বার্তা বয়ে আনে তারা যেন নবজীবন পায় - "চল। চল। সভা হবে, দেখতে চল।

সোসালিস্ট পার্টির সভার খবরে সবচেয়ে আলোড়ন তুলেছে সাঁওতালটোলীতে। গ্রামে হাসপাতাল খোলার খবরে সাঁওতালদের মধ্যে তেমন বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। গাঁয়ের ঝগড়া কাজিয়া কি মিলন সম্প্রীতির ব্যাপারেও তাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই সভার ব্যাপারটাই আলাদা। লাঙল যার, জমিতার ? কর্মনিষ্ঠ শ্রমজীবি সাঁওতাল কিষানের মগজে যত অমীমাংসিত সমস্যার বোঝা, এ সভায় বুঝি তার সমাধান পাওয়া যাবে। এ সভা জমি যারা জোতে, তাদের সভা। সত্যি।

'জমি কার ..... যে চষে তার। যে হাল চেষে, সে-ই বীজ বুনবে, যে বুনবে সেই ফসল কাটবে। যে খাটবে সে-ই খাবে; এই নীতির ভিত্তিতে যা হবে তা হবে।" এই সব উক্তি সোসালিস্ট পার্টির সভ্য কালীচরণের নবলব্ধ চেতনা।

স্বাধীনতার পর দেশ শাসনে বিশৃংখলা আমলাতন্ত্র, সরকারি অব্যবস্থা, পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীদের; অর্থলোলুপতা, স্বার্থপরতা; রাজপুত-যাদব-কায়স্থ বিভিন্ন জাতপাতের সমস্যা, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অধিকার রক্ষার নতুন আন্দোলন। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র-বঞ্চনার তীব্রতা-এসব ছবিই আমরা ময়লা আঁচলে পেয়ে যাই। ক্রমশঃ সাধারন সরল গ্রাম্যমানুষরাও বুঝতে পারে রাজনৈতিক কর্মীরা কিভাবে বদলাচ্ছে ভ্রষ্টাচার কিভাবে ছড়াচ্ছে। তাদের চোখে বলদেবরা হয়ে ওঠে 'বগুলা লগত' (বিড়াল তপস্বী) .....'বলদেওজী কিছু বলবার জন্য দাঁড়াতেই বাসুদেও উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'বালদেওজী আপনার ব্যাখ্যানা আমরা অনেক শুনেছি। আপনি হলেন পুঁজিবাদ। এ সভায় আপনি বলতে পাবেন না।'

জনতাও তাঁর বিরোধী - 'বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। যান, কাপড়ের পুঁজী বাঁটুন গিয়ে, চিনি বিল্যাক করুন।'

স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে সুযোগ সন্ধানীরাও নড়ে চড়ে উঠেছিল। এই উপন্যাসে প্রকৃত সৎ গান্ধীবাদী চরিত্র বামন দাস। সুযোগসন্ধানী রাজনীতির মানুষরা কিভাবে গ্রাম ছেড়ে শহরের রাজনীতির দিকে ঝুঁকছেন তা তিনি দেখিয়েছেন। গান্ধী হত্যায় তার হৃদয় ভেঙে যায়। আশাহত বামন দাস ভারত-পাক সীমান্তে চোরকারবারীদের হাতে নিহত হন। ক্ষুদ্রাকৃতি ঐ মানুষটি ছিলেন মহৎ আকাংখার বিশাল আধার। তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি চোরাকারবারীদের প্রতিরোধ করবেন, কিন্তু তিনি পারেন না। বামনদাসের মৃত্যু এক অসাধারন মৃত্যু মহাকাব্যের এক বীর চরিত্রের মৃত্যুর মতই মহিমা ব্যাঞ্জক (রেণুর 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের বামন দাসের চোরাকারবারীদের সংঘর্ষ ও বর্ণনাংশ, সতীনাথের 'গণশহায়ক' গল্পের কথা মনে পড়ায়।)

"..... 'কটহার দুলারচন্দ কাপরা - সেই যে জুয়া কোম্পানীওলা, যার ক জুয়োর আড্ডায় নেবীলাল, ভোলাবাবু আর বাওন দাস ফারবিসগঞ্জের মেলায় পিকেটিন করেছিল। জুয়াও নয়, একেবারে গাঁটকাটার ব্যাবসা, পকেটমারীর খেলা ..... সেই সঙ্গে মোরঙ্গিঁয়া দারু গাঁজা আর মোরঙ্গিঁয়া লেড়কীর কারবার করত। সেই কাপরা আজকাল কটহা থানা কংগ্রেসের সিকরেটরী। তারই গাড়ি। ..... কলিমদ্দিপুরের চেক পোষ্টের সেপাই এগিয়ে আসে গলা খাঁকারি দিয়ে বলে - "কৌন হৈ? পাশের ঝোঁপ ঠেলে বামন বেরিয়ে আসে। বলে "হম হায়। সেবক বাওনদাস।

'বাওন দাস'। সেপাইজীর মুখের হা বন্ধ হয় না। এই লোকটিকে সে সন তিরিশ থেকে জানে। চাঁদ টলে যাক্ সূর্য গলে যাক .....। পায়ে চলা পথের ঠিক মাঝখানে - পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছে বামনদাস। .....

"বামন। রাস্তা ছেড়ে দাও। গাড়ি পাস করতে দাও।"

''আসুন না সামনে। পাস করান গাড়ি। আপনিও কংগ্রেসের মেম্বার, আমিও। খাতা খোলা আছে - যে যার হিসেব নিকেশ করে ফেলি আসুন। ..... আজকের এই পবিত্রদিনে আমি কলংক লাগাতে দেব না।" .....

"বাওন দাস। কথা শোনো"।

" ....."

'ইসপিরিং খাঁ - গাড়ি হাঁকাও"। .....

গরুর গাড়ি পাস হয়ে গেল। ..... পার হয়ে যাচ্ছে। বামনদাস মেঠো রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, তার মাথা টপকে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। ..... পার হয়ে যাচ্ছে। বলদগুলো ভড়কাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু .....। তিন.....চার.....চার চারটে গাড়ি পেরিয়ে গেল ?

এবারে বামন দাস বলদের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। বলদ তাকে গুঁতো দিয়ে ফেলে দিল। বামন গড়িয়ে পড়ল। গড়িয়ে একেবারে ..... চাকার তলা পড়ে গেল।

ঝড় ঝড় ঝড় ঝড়।

- ..... বাপু। মা। .....।

গাড়ি পাস। কর করর্ কট। ..... গাড়িগুলো পাস হয়ে যাচ্ছে। পঞ্চাশখানা গাড়ি।

শেষ গাড়িটা চলে যাবার পর, হাবিলদার আর রামবুঝাওন দুজনে মিলে বামনের ছিন্নভিন্ন লাশটা, রক্তে কাদায় মাখা লাশটা তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকে। ..... নাগর নদীর ওপারে, মানে পাকিস্তানে ফেলে দিতে হবে। খবরদার এদিকে কিন্তু নয়, ... কোনমতেই এপারে নয়।

দুলাল চন্দ্র কাপরা বামনের ঝুলিটা হাতে নিয়ে তাদের পেছন পেছন হাঁটে। নাগর পেরিয়ে যাবার সময় ঝুলি থেকে বামনের গলার তুলসীমালাটা নদীতে পড়ে ভেসে যায় - সীতারাম।

ভোর চারটের সময় পাকিস্তানী পুলিশ ঘাট-গস্ত লাগাতে গিয়ে দেখে লাশ।

"আরে এতো ওপারের বামনার লাশ। এখানে কী করে এল ? ও বুঝেছি। ..... উঠাও জী, হানিফ আর জুম্মন, লে চল উস পার।'

- বামনের হিমলাশ ঝুলি ঝাণ্ডা নিয়ে আবার উঠল।

- বামন তার অতি খর্ব পায়ের দুটি মাত্র পদক্ষেপে দুটি স্বাধীন দেশের হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান - সততা আর মানবতার জরীপ করে গেল।

নাগর নদীর মাঝামাঝি জায়গায় এসে পাকিস্তানী পুলিশ অফিসার সায়েব বললেন - "নদীতেই ফেলে দাও। আর ঝুলিটা ওপারে গাছের গায়ে লটকে দাও। জলদি'। নাগর নদীর ধারা হঠাৎ কলকলিয়ে ওঠে। খঞ্জনিটা জলে ফেলতে ফেলতে সেপাই গেয়ে ওঠে - ডমরু বাজাকে রঘুপতি রাঘব ..... ঝনক .....।

দেশ স্বাধীন হবার পর ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে একজন প্রকৃত দেশসেবকের লড়াই অজ্ঞাতই থেকে যায়। বামন দাস এই রকম হাজার হাজার অজানা দেশপ্রেমিকের প্রতীক, যারা ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশের জন্য জীবন দান করেছেন।

'ময়ূলা আঁচল উপন্যাসের শুরু ম্যালেরিয়া সেন্টার খুলবার সূচনা দিয়ে। এই সেন্টার-এর ডাক্তার হয়ে আসেন শহরের ডাঃ প্রশান্ত। কৌতূহলজনক এই যে চরিত্রটি আঞ্চলিক নয়। শহরের জীবনের সমস্ত আকর্ষন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রলোভন ত্যাগ করে মানুষের সেবার জন্য ডাঃ প্রশান্ত গ্রামে এসেছেন। প্রশান্তর চোখে ভারতবর্ষের গ্রাম আর গ্রামবাসীদের ছবি রেণু অত্যন্ত কুশলী। চিত্রকরের মত এঁকেছেন। প্রশান্ত তার বান্ধবী ডাঃ মমতা শ্রী বাস্তব কে চিঠিতে লিখেছে ....." এ এক নতুন পৃথিবী। জায়গাটাকে স্বচ্ছন্দে বজ্র দেহাত (অজ পাড়াগাঁ) বলতে পার। ..... কাজ শুরু করে দিয়েছি। সকাল সাতটা থেকেই রুগীদের ভিড় জমে যায়। আপাতঃ জেনারেল সার্ভে করে যাচ্ছি। রক্ত পরীক্ষা চালাচ্ছি। পিয়ার্সন মতে এখানকার কাকেদেরও ম্যালেরিয়া আছে।

..... এখানকার পুকুরে ডোবায় খালাখন্দে সর্বত্র পদ্মপাতা বোঝাই হয়ে থাকে। এরা বলে, ফুলের মরশুমে নাকি খানায়-ডোবায় অদ্দি রঙবেরঙের পদ্ম শাঁপলা ফুটে থাকে। ..... তা বলে এখানকার লোককে কিছুতেই লোটাস-ইটার্স বলা যাবে না। খানা ডোবাগুলো পরীক্ষা করাচ্ছি। ..... এখানকার মাটি সম্ভবতঃ বারোমাসই ভিজে থাকে।

গাঁয়ের লোকগুলো বড় সরল অবিশ্যি সারল্য মানে যদি অশিক্ষা, অজ্ঞতা আর অন্ধবিশ্বাস বোঝায় তা হলে এরা বাস্তবিকই সরল। তবে যদি বৈষয়িক বুদ্ধির কথা তোল, তবে তোমার-আমার মতন লোককে এরা দুবেলা ঠকাতে পারে। আর এদের বাহাদুরী হল এই যে, হাজারবার ঠকেও তুমি এদের সারল্যেমুগ্ধ হতে বাধ্য। এ হল আমার বিগত সাতদিনের অভিজ্ঞতা। ভবিষ্যতে এসব ধারনা ভুল প্রমাণিত হওয়াও সম্ভব। মিথিলা আর বাংলার মাঝখানের এই জায়গাটুকু বড় মনোহর। মেয়েরা সচরাচর সুন্দরী, তাদের স্বাস্থ্যও মন্দ নয়।"।

ডাঃ প্রশান্ত জন্ম থেকেই নিঃসঙ্গ। জন্মের পরই সে পরিত্যক্ত। ডাক্তার অনিল কুমার ব্যানার্জীর পুত্ররূপে সে পরিচিত। উপাধ্যায়ের আশ্রমের ডাক্তার অনিলকুমার ব্যানার্জীর

ত্যাগ করা স্ত্রীর কাছে সে প্রতিপালিত। তার কাছে জাত-পাতের ব্যাপার গুরুত্বহীন।

কিন্তু গ্রামে মানুষরা নাম জিজ্ঞাসা করবার পরই জানতে চায় সে কি জাত। প্রশান্তর জাত কি ? জবাবে উত্তর দেয় - হিন্দুস্থানী ভারতীয়। এই সরল উত্তর গ্রামবাসীদের ভ্রান্তি ঘুচায় না। শহরের মানুষকে তারা সন্দেহের চোখে দেখে। তার চিকিৎসা পদ্ধতিকে গ্রহণ করতে চায় না। কিন্তু গ্রামবাসীদের জন্য প্রশান্তর দরদ, সেবার মনোভাব, লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে। বিশেষ করে কলেরার মহামারীর সময় প্রশান্তর চিকিৎসা-সেবা তাকে গ্রামবাসীদের কাছে দেবতায় পরিণত করেছিল ।

ম্যালেরিয়া গবেষনা করতে করতে ডাঃ প্রশান্ত অনুভব করতে পারে গ্রামবাসীদের দারিদ্র আর অজ্ঞতা - এ রোগের দুই কীটানু যা এনোফিলিসের চেয়ে ঢের বেশি বিপজ্জনক, স্যান্ডফ্লাই-এর চেয়ে অনেক বেশি বিষাক্ত। ক্রমে-ক্রমে ডাঃ প্রশান্ত গ্রাম ও গ্রামবাসীর গভীরে প্রবেশ করে। খুঁজে পায় গ্রাম জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা, গ্রাম ও গ্রাম-বাসীর প্রকৃত রূপ যেন এক আশ্চর্য ভারত সন্ধান।

" গাঁয়ের মাটি ডাক্তারের মনে মোহের ঘোর বিছিয়েছে। আজকাল মনে হয়, যেন কত যুগযুগান্তর থেকে এ মাটিকে সে চেনে। এ যেন তার আপন মাটি। এখানকার নদী পুকুর, গাছপালা, বন প্রান্তর জীবজন্তু কীটপতঙ্গ - সব কিছুই তার চোখে অপরূপ লাগে .....।

আম গাছের শাখাগুলি রসাল ফলভারে অবনত - ডাক্তার দেখে। কিন্তু তার আগে তার নজর কেড়ে নেয় সেই মানবকগুলি - ঐ আমের আঁটির তুচ্ছ শাঁসের রুটির ওপর যাদের নির্ভর করে বাঁচতে হয়। ..... এই মানুষ। ক্ষুধিত, অতৃপ্ত মানুষের আত্মা কদাচ, নীতিভ্রষ্ট হয়, কখনো হয় বিদ্রোহী, এরকম আশা করাই তো বোকামী। অথচ ..... ডাক্তার গ্রামের দৈন্য আর নিরুপায়তায় স্তম্ভিত হয়ে ভাবে এই আশ্চর্য সন্তোষ কী করে সম্ভব ? কোন মহৎ আদর্শ ওদের ধারন করে আছে ? কোন্

সে কঠোর নীতির অনুশাসন যা কয়েক সহস্র বুভুক্ষ প্রাণকে নিগড়ে বেঁধে রেখে দিয়েছে - একচুলও বিচ্যুত হতে দেয় না।

.... শ্লেষ্মায় বোঝাই দুটি ফুসফুস, গায়ে দেবার তেনাটুকু নেই, বিছিয়ে শোবার চেটাই নেই, এক মুঠো খড় পর্যন্ত নেই। ভিজে মাটির ওপর পড়ে থেকেও নিউমোনিয়ার রুগী মরে না, বেঁচে যায়। ..... কেমন করে ?

এখানে বিভিন্ন ভিটামিনের পৃথক গুনাগুন আর আবশ্যকতার ওপর লম্বাচওড়া তালিকা বানিয়ে বিতরন করার বুদ্ধি যাদের হয়, সেই বিবেচনাশীলদের কথায় মুখর হয়ে লাভ নেই। ..... যশার ছবি, যশা থেকে বাঁচবার উপায় নিয়ে রঙবেরঙের পোস্টার এঁকে অথবা ম্যাজিক লণ্ঠনে নানান ছবি দেখিয়ে ম্যালেরিয়ার বিভীষিকা থেকে রক্ষা পাবার উপকার করতে যাঁরা চান, তারা কোন্ দেশের লোক ? .....

ডি.ডি.টি আর যশারি তো বহু দূরের কথা, গায়ে সরষের তেল মাখাও এখানে ভোগবিলাসের মধ্যে গণ্য। ..... খেতের শ্যামমৃত্তিকার সঞ্জীবনী এদের জীইয়ে রাখে। শস্য-শ্যামলা, সুজলা সুফলা ..... মা নয় তো কী ?

মেরীগঞ্জ ম্যালেরিয়া অনুসন্ধান সংস্থার গবেষক ও ডাক্তার প্রশান্ত কুমার তহশীলদার বিশুনাথ প্রসাদের মেয়ে কমলীর চিকিৎসা করতে করতে তার প্রেমে পড়ে যায়। সহজ-সরল এই গ্রাম্য যুবতী নিঃসঙ্গ প্রশান্তর হৃদয়কে ভালোবাসায় মথিত করে। তাদের সম্পর্ক নিকট থেকে নিকটতর হয়। গ্রাম ও গ্রামবাসী সম্পর্কে শিক্ষিত শহরের মানুষের যে সামাজিক দায়িত্ব তা প্রশান্ত কখনোই ভুলতে পারে না। গ্রামের মানুষের সেবা, চিকিৎসা, কমলীর সাহচর্য্য এইভাবে প্রশান্তর দিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু গাঁয়ে যখন ঝড় উঠল ভূমিহীন মানুষরা যখন আওয়াজ তুলল - "ইয়ে আজাদী ঝুঠী হ্যায়, দেশকী জনতা ভুখী হ্যায়। ভূমিহীন আঁওতালদের সংঘর্ষ, আহতদের চিকিৎসা - এসব কাজে ডাঃ প্রশান্তর সহানুভূতি থাকায় তাকে কম্যুনিষ্ট সন্দেহে গ্রেফতার করা হল।

ওদিকে মেরীগঞ্জ গ্রামে ভূমিহীন মানুষদের শোচনীয় অবস্থা - অভাব আর অনাহারে। এসবের মধ্যে কমলা সন্তান সম্ভবা। উপন্যাস শেষে ডাঃ প্রশান্ত মুক্ত হয়ে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে। বিশ্বনাথ প্রসাদ ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বিতরন করছে। প্রশান্ত কমলা ও তার সন্তানকে স্ত্রী-পুত্রের স্বীকৃতি দিচ্ছে,। কাহিনীর পরিসমাপ্তি ডাঃ প্রশান্তর আশা দিয়ে। গ্রাম জীবনের সমস্ত ব্যার্থতা সত্ত্বেও সে ঘোষনা করে - "মমতা! আমি আবার কাজ শুরু করব - এইখানে, এই গ্রামে। আমি ভালবাসার চাষ করব - এইখানে, এই গ্রামে। আমি ভালবাসার চাষ করব, মমতা। অশ্রু সিক্ত মাটির বুকে ভালবাসার নতুন চারারা সতেজ, সজীব হয়ে উঠবে। আমার সাধনা শুরু হবে - পল্লীমায়ের ময়লা আঁচলের ছায়ায়। মহৎ কিছু, বিরাট কিছু নাই হ'ল - অন্ততঃ একটা গ্রামের একমুঠো মানুষের রক্তঝরা মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে পারব, তাদের বুকে আশার আর বিশ্বাসের অংকুর জাগিয়ে তুলতে পারব তো।' এই আশার বাণী, এই মিলনান্তক পরিসমাপ্তি সম্পর্কে রেণু নিজেই বলেছেন - 'ম্যায় সমঝাতা হুঁ কি মেরা 'মৈলা আঁচল' বহুত প্যাথেটিক ইয়া দুঃখান্ত উপন্যাস হ্যায়, লেকিন উসমে এক প্রেম-কথা ভী হ্যায় - উসকা সুখান্ত হুআ হ্যায়।" ইসকা মতলব ইহ হ্যায় কি এক ভরোসা হ্যায় - আশা হ্যায়।" কিন্তু এই আশা রেণুকে যতখানি উত্তেজিত করেছে ততখানি শৈল্পিক নিরাসক্তি দেয়নি। লেখকের এই মানবীয় সংবেদনা তার লেখন ধর্মের প্রতি প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করেছে "ইয়হী মানবীয় সংবেদনা হ্যায় জো প্রস্তুত কৃতী কো এক বিশিষ্ট গরিমা প্রদান করতী হ্যায়। ইস প্রকার ইহ কথা বস্তুতঃ দেশকে এক 'মৈলা অঞ্চল' কী হী কথা নহী, বরণ্ ইহ মানবীয় সংবেদনা কী প্রতিষ্ঠাত্রী কথা ভী হ্যায় জিসকে দ্বারা লেখক কী অপনে লেখন-ধর্মকে প্রতি প্রতিবদ্ধতা ভী প্রমানিত হোতী হ্যায় আউর ব্যাক্তি সমাজকে প্রতি উদার চেতনা ভী।" [২০]

রেণু ডাঃ প্রশান্তর মাধ্যমে শহরের শিক্ষিত মানুষের সাথে ভারতবর্ষের উপেক্ষিত গ্রামবাসীদের সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন। শিক্ষিত শহরের মানুষজন নিরন্ন-দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের জন্য কিছু করুক রেণু তা ভীষণভাবে চাইতেন। শিক্ষিত মানুষজনদের

গ্রামবাসীদের যে বিরাট ব্যবধান তা রেণুকে খুব কষ্ট দিত। ওরাহী হিংনা গ্রামের সম্পন্ন কৃষক সন্তান রেণু, এলাহাবাদ-পাটনা-বেনারস-দিল্লীর মত বড় বড় শহরে গিয়েও ভুলতে পারতেন না তার গ্রামকে। গ্রাম জীবন তাকে ভীষণভাবে টানত। গ্রামজীবনের সাথে তার এই গভীর আত্মিক যোগের কথা বহুবার বহু প্রসঙ্গে বলেছেন - (দ্রঃ 'এক বলন্দ খুদী ..... উর্ফ মশাহুর নকক্কোর কা কিস্সা(গুটকা)' অচ্ছে আদমী, পৃঃ ১৩-১৯)

গ্রাম জীবনের সংকীর্ণতা, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, দলাদলি কুসংস্কার, জাতপাতের দ্বন্দ্ব সব তিনি দূর করতে চেয়েছেন যুক্তমনা উদারচেতা ডাক্তার প্রশান্তর মত চরিত্রের মধ্য দিয়ে। যারা গ্রামে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সেবামূলক কাজগুলি করবেন। রেণুর এই আকাংখারই প্রতীক রূপ ডাক্তার প্রশান্ত। এ সম্পর্কে রেণু সাহিত্যের গবেষিকা ডাঃ অঞ্জলি তেওয়ারী লিখেছেন - " 'রেণু'নে ডাক্টর মে কুছ নিজী বিশেষতাও কা বিকাস হুঁসলিএ কিয়া হ্যায় উহ স্বয়ং উসকে মাধ্যম মে পড়ে - লিখে বর্গকা, গাঁও কী উপেক্ষিত ধরতী কে সাথ গহরা লগাও স্থাপিত করনা চাহতা হ্যায়। জো লোগ পড়ে লিখে হ্যায়, জো গাঁওকে লিএ কুছ কর সকতে হ্যায়, ওয়ে গাঁও সে কটতে জা রহে হ্যায়। লেখক কো ইস বাত কী গহরী পীড়া হ্যায়। উহ জৈসে ইহ চাহতা হ্যায় কি কাশ পড়ে-লিখে লোগ গাঁওকে মৈলে আঁচল সে জুড় পাতে আউর ইসকে লিএ কুছ কর পাতে। কঠিনাই ইহ হ্যায় কি পড়ে - লিখে লোগ ভী জাতি-পাঁতি, ছোটে-বড়ে ধনী গরীব কে কঠঘরো মে অপনে কো ফিট কর সমাজ কী গলাজত কে হী অঙ্গ বনতে জা রহে হ্যায়। রেণু নে ডাক্টর কো ইস গলাজত কে বিরুদ্ধ খড়া কিয়া হ্যায়।" [২১]

রেণু ডাঃ প্রশান্ত কে জাতি-গোত্র-বর্ণ বিহীন করে এক শুদ্ধ মানুষে পরিণত করেছেন। 'ময়লা আঁচলে'র বিভিন্ন বর্ণের রাজপুত-যাদব-ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণের জাতপাঁতের দ্বন্দ্বের মধ্যে ডাক্তার প্রশান্ত যেন এক শুদ্ধ মানবত্মা। নিম্নবর্গের দলিত মানুষজনদের জাগরনে, ভূমিহীন আত্মরক্ষার অধিকারের চেতনায় ডাঃ প্রশান্তর সহানুভূতি

কোন বিশেষ রাজনীতির দ্বারা আবদ্ধ নয়। এখানে রেণু কোন সমাজবাদী বা কম্যুনিষ্ট মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হননি। এখানে তিনি সম্পূর্ণ মানবতাবাদী। গ্রামের জীবনের জমিদার না হয়ে শহরের রাজনীতিবিদরা, তিনি যে দলেরই হোক না কেন, কংগ্রেস, সোসালিষ্ট, হিন্দু মহাসভা সবাই চান তার দলের প্রসারে গ্রামবাসীদের টানতে। তাই সেখানে তারা জাতপাতের আবেগকে উস্কে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে সেই বর্গের নেতা পাঠান যাতে আদর্শ নয় সেই বর্গের মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। ডাক্তার প্রশান্ত এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত, গ্রামবাসীর হিত সাধনই তার একমাত্র লক্ষ্য। সংকীর্ণ মেরীগঞ্জে তার কার্য্যকলাপ যেন অনাবিল মুক্তির শুদ্ধ বাতাস।

কিন্তু ডাঃ প্রশান্তর চরিত্রও যথার্থ হয়ে উঠতে পারেনি। ডাঃ প্রশান্ত পরম মানবতাবাদী মূল্য দৃষ্টি সম্পন্ন পাত্র, ধীরে ধীরে তার মধ্যে মার্কসবাদ - সমাজবাদী মূল্য চেতনার বিকাশ ঘটে। এই চেতনায় আবার লেখকের ব্যক্তিগত অনুভব বিশেষভাবে কাজ করেছে। ডাঃ প্রশান্তর মত চরিত্র সৃষ্টি করে, নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি রেণু ব্যক্ত করেছেন। শুধু 'ময়লা আঁচলে'র ডাঃ প্রশান্ত নয়, পরবর্তী উপন্যাসে এই ধরনের চরিত্রে একাধিক বার এসেছে, পরতীপরিকথার জিতেন্দ্র, 'জুলুস'এ 'পবিত্রা' দীর্ঘতপা'র 'বেলা' প্রমুখ চরিত্ররা। এদের মাধ্যমে লেখক নিজের কথা বলেছেন। ফলে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। 'ময়লা আঁচলে' মেরীগঞ্জ গ্রামে অভিশপ্ত শোষন, সংকটের এক প্রধান উৎস তহশীলদার বিশুনাথ প্রসাদ। অথচ এই বিশুনাথ প্রসাদের সাথে প্রশান্তর কোন বিরোধিতা নেই। বিশুনাথ প্রসাদের একাধিক অন্যায়-অবৈধ কার্য্যকলাপে প্রশান্ত কোন প্রতিবাদ করেনা, এখানেই যেন চরিত্রের তথা মূল্যবোধের অসঙ্গতি।

তহশীলদার বিশুনাথ প্রসাদের মনোভাবের পরিবর্তন ভূমিহীনচাষীদের মধ্যে জমি বিতরন, কোন সামাজিক হিত সাধনের জন্য নয়। তার ব্যক্তিগত খুশীর জন্যই এই কাজ। 'জুলুসে' তালেবর গোড়ীর ব্যক্তিগত আনন্দেই 'পবিত্রা' কে সব কিছু দিয়ে কন্যারূপে গ্রহণ করা। 'দীর্ঘতপা'য় শ্রীমতি আনন্দর বিরুদ্ধে বেলার সংঘর্ষ কোন সামাজিক

চেতনা থেকে উৎপন্ন নয়। রেণু উপন্যাসে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেননি। এসব কারণেই 'ময়লা আঁচলের' মত উপন্যাস, 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'র মত সার্থক উপন্যাসের সৃজনশৈলীর গভীরতা থেকে অনেকখানিই বিচ্যুত।

রেণু এই উপন্যাসের মাধ্যমে নবীন আশার কথা বলতে চেয়েছেন, তাঁর একেবারে শেষের উপন্যাস 'পল্টুবাবু রোড' পর্যন্ত এমন কিছু চরিত্রের সন্ধান দিয়েছেন যারা তাঁর আদর্শবাদ প্রসূত ও আবেগজাত। এইখানে তাঁর মিল তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সামন্ত তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিভূ হয়েও তারাশংকর সৃষ্ট কিছু চরিত্র দেশ সেবার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং অন্যান্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রায় ষাট বছরের ইতিহাসকে তার গল্প উপন্যাসে ধরে রেখেছিলেন সেই 'চৈতালি ঘূর্ণী' 'পাষান পুরী'র আমল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কতকগুলি বাঁধা ছকে প্রকাশিত হয়েছে। সৎ জমিদারীর দেখিয়েছেন সৎ আদর্শের মধ্যে (লক্ষণীয় পরতি পরিকথার জীতেন্দ্র চরিত্র)। রেণুও কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রায় অর্থনৈতিক বিপ্লব হয়েছে বুঝেও বিদ্রোহের মধ্যে নতুন কালের সূচনা সম্পর্কে অভিহিত হয়েও, সমস্যার সমাধাণ করেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছকে। তাই গ্রামবাসীদের পরিবর্তন তাকে যতখানি উত্তেজিত করে ততখানি শৈল্পিক নিরাসক্তি দেয় না।

ভারতবর্ষের দরিদ্র অবহেলিত বিশাল জনগনের একজনকে দেশের প্রগতি চেতনার বাহক করে তোলা ও তার মধ্যে 'ভারতীয়ত্ব' প্রতিফলিত করার পরিকল্পনা কোনো না কোন ভাবে সতীনাথ ও রেণুর মধ্যে ছিল। কিন্তু সতীনাথের পরিণত ও পরিশীলিত মননদীপ্ত ও বিশ্লেষনী রচনারীতির সাথে রেণুর অনেক পার্থক্য। রেণু তাঁর উপন্যাসে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারেননি তাঁর বক্তব্য সোচ্চার, চরিত্রচিত্রণ পক্ষপাতমূলক। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' মহাকাব্যের আকারে পরিকল্পিত এই উপন্যাসে মহাকাব্যের মতোই আছে - 'কথা বস্তুর ব্যাপ্তি ও ভাববস্তুর উন্নত নীতিসচেতনতা' আছে নায়ক চরিত্রের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, আর মহাকাব্যের মতোই তা শেষ হয়েছে 'সবিষাদ শান্তরসে।' রেণুর 'ময়লা আঁচলে' তেমনটি পেলাম কই ? দুটি উপন্যাস দুটি দিক থেকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে

ভারতবর্ষকে। একটি যা দেয়, অপরটি তা দিতে পারে না। রেণুর উপন্যাসে যে আশার ছোঁয়া থাকে - তা মূলত আদর্শবাদ প্রসূত ও আবেগ জাত আর সতীনাথের নিরাশাবোধ তাঁর যুক্তিবোধ ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি মিলিয়ে তথ্যাভিত্তিক অভিজ্ঞতা। তবুও 'ময়লা আঁচলে'র পাত্র-পাত্রীর ভাবনা-বেদনা ও চেষ্টার দেশকালগত বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের কারণে এমন একটা বিশালত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়, যা অনেকটা এপিক ধর্মী। এই বিশাল রসের সংস্কার এপিকেই প্রত্যাশা করা যায়। ময়লা আঁচলের এই মহাকাব্যিক লক্ষণের আলোচনা শেষ করা যেতে পারে, সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্য দিয়ে - 'বৃহৎ জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবার আকাংখা আধুনিকেরই আকাংখা। গোরা উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে যেমন সেই আকাংখার প্রতিফলন, গোরার সংগঠন পদ্ধতি - প্রকরণও সেই অনুযায়ী। চরু-ঘোষপুর যদি গোরা উপন্যাসে আরো প্রাধান্য পেত, তাহলে নিশ্চই গোরা আর এই উপন্যাস থাকত না, সম্পূর্ণ ভিন্ন উপন্যাস হয়ে উঠত। কিন্তু জনজীবন পল্লীজীবন যেটুকু গোরাতে যতটুকু স্থান পেয়েছে, তার মধ্যেই আমরা বাংলা উপন্যাসের একটা নতুন ধারার ইঙ্গিত পেতে পারি। বুঝতে পারি, এই ধারাতেই এসেছে সতীনাথের ঢোঁড়াইচরিত মানস, অমিয়ভূষণের গড় শ্রী খন্ড। যদিও হিন্দীতে রচিত, তাহলেও ফণীশ্বর নাথ রেণুর ঢোঁড়াই চরিত প্রভাবিত ময়লা আঁচলের নাম বা নাটক হলেও বিজন ভট্টাচার্যের নবান্নের নাম আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। ....."[২২]

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসের শিল্পগত বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য।

'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচলের' শিল্প রীতিতে পার্থক্য প্রচুর। উপন্যাস দুটির কাহিনীর উপাদানে সাদৃশ্য থাকলেও, গঠনরীতির পার্থক্যগুলি লক্ষণীয়। দুজনের ঔপন্যাসিক পদ্ধতি স্বতন্ত্র।

প্রতিটি সার্থক সাহিত্য সৃষ্টিতে শিল্পগত কিছু বিশিষ্ট লক্ষন অবশ্যই থাকে। যত্নবান লেখক মাত্রেই প্রতিটি রচনায় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন এবং নিজস্ব ক্ষমতাও বিবেচনা অনুযায়ী নানা কৌশলে সেগুলির সমাধান করেন। বিষয় বিন্যাস,

বর্ণনাভঙ্গী, নাটকীয়তা, কাব্যময়তা চমক বা উৎকণ্ঠা-সৃষ্টি তুলনা বা বৈপরীত্য সৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র কৌশলে রচনার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' রচনা করতে গিয়ে সতীনাথ যেমন তাঁর আঙ্গিক নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন রেণুর আঙ্গিক-কৌশলচর্চা সতীনাথের মত অত প্রখর না হলেও তাঁরও নিজস্ব আঙ্গিক ভাবনা ছিল। রেণু ও সতীনাথের সৃজন প্রতিভা, স্থানীয় সাহিত্য-শিল্প-উপাদান দ্বারা প্রভাবিত। দুজনের রচনার ভাষা আলাদা হলেও একই বিষয়, ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে।

রেণুকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল সতীনাথের রচনা। ঢোঁড়াইচরিত মানস'এ রেণুর জন্য সতীনাথ তাঁর উপন্যাস রচনার পথের একটি হদিশ রেখে দিয়েছিলেন।

কোনো উপন্যাসের মহিমা নির্ভর করে বাস্তব মানুষের কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে মূল্য গভীর জীবন সত্য সন্ধানের ওপর। আবার এর শিল্প গৌরব বহুলাংশে নির্দিষ্ট হয় তাৎপর্যময় জীবনদর্শনের দ্বারা। ঔপন্যাসিক তাঁর অভিজ্ঞতা, প্রবনতা দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পচেতনার সাহায্যে একটি সুসংহত ও সামগ্রিক জীবনরূপ রচনার প্রয়াসী হন এক গভীর অদ্বয় বোধ থেকে। প্লট বা কার্যকারণ-সম্বিত আখ্যান, চরিত্রায়ন, সংলাপ, পরিবেশ বা তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বর্ণনা এবং জীবন ভাষ্যর উপাদান অবিমিশ্র ধারায় সৃষ্টি হলেও প্রকৃত পক্ষে শেষোক্তটি, অন্যগুলিকে নির্দিষ্ট করে। সতীনাথের 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও রেণুর ময়লা আঁচল' এ উভয় ঔপন্যাসিকের জীবনাদর্শ। কাহিনী-চরিত্রের যে সাযুজ্য তা বাইরের কিন্তু অন্তর্নিহিত সত্যে উপন্যাস দুটি আলাদা।

সতীনাথ ও রেণু যে-উদ্দেশ্য নিয়েই লিখুন না কেন উপন্যাসের তাঁরা জীবনের প্রতিভাস সৃষ্টির প্রচেষ্টা করেছেন। উত্তর বিহারের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা, স্থানীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক গতি-প্রকৃতি, রাজনৈতিক কর্মকান্ড, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান - এই প্রকার বহুবিধ বিষয়কে, দেশকাল মানুষের এই বিরাট প্রেক্ষাপটকে উপন্যাসের পরিমিত পরিসরে শিল্পসম্মত আকার দিয়ে চিত্তাকর্ষক করে তোলা নিঃসন্দেহে যে কোন ঔপন্যাসিকের পক্ষে এক দুরূহ কাজ। রেণু ও সতীনাথ তা করেছেন। এই সৃজনক্রিয়ায় তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের উপযোগী কৌশল নির্ধারণ করেছেন। এতে দুই ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিগত-শিল্পগত বিশিষ্টতা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও'ময়লা আঁচল'এ।

এই উপন্যাস দুটির প্রায়ই একযোগে আলোচিত হবার অন্যতম কারণ এই দুটি উপন্যাসের লেখক একই অঞ্চলের অধিবাসী ও এঁদের পারিপার্শ্বিক যে জগৎ তাঁদের শিল্পী মানসকে পুষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করেছে। একই অভিজ্ঞতা দুজনকে রচনায় সহায়তা করেছে, কিন্তু বিষয় এক হলেও দুজনের প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন। লেখকের সঙ্গে লেখকের আত্মীয়তা শুধু দেশকালের বন্ধন নয়, গভীরতর জীবনদৃষ্টি ও বক্তব্যের সাদৃশ্যজাত। সতীনাথের জীবনদৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গী ফণীশ্বর নাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল, প্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু 'যমুলা আঁচলে' রেণুর স্বাতন্ত্র ও প্রকাশ পেয়েছিল। সতীনাথ রেণুকে এক সময়ে বলেছিলেন, 'আমরা যখন কোনো কথা বলি অনেক কথা ভিতরে থেকে যায়। অনুচ্চরিত থাকে অনেক শব্দ ও কথা। ওই শব্দগুলি যে ভিতরে আওড়ায় সেই হলো তোমার গোপন আমি। তাকে সযত্নে ধরবার চেষ্টা করো। ওই হলো তোমার আসল আমি, তোমার কাজের মানুষ।" বলাবাহুল্য সতীনাথের 'গোপন আমি' আর ফণীশ্বর নাথের 'গোপন আমি' এক হতে পারে না।

সাধারণতঃ এই দুটি উপন্যাসের যে সাদৃশ্য তা হল একই স্থানের, একই কালের বর্ণনা। পূর্ণিয়া জেলার গ্রামগুলির মধ্যে অনেক মিল, উভয় উপন্যাসের নরনারীর আচার-আচরণেও অনেক সাদৃশ্য। দুজনেই উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষা প্রচুর পরিমানে ব্যবহার করেছেন। দুজনের উপন্যাসের রচনার লক্ষ্য ও যেন আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হয়। দুজনেই উপন্যাসের মধ্যে ধরতে চেয়েছেন পরিবর্তমান ভারতবর্ষের ছবি। রেণু পূর্ণিয়া জেলার একটি অনগ্রসর গ্রামকে পল্লীভারতের প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপন্যাসের আখ্যানভূমি বেছে নিয়েছেন। সতীনাথও চেয়েছিলেন - 'ইচ্ছা ছিল আমার জানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমন ভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুল ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসেবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে তাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব।' এই ইচ্ছা থেকেই তিনি তাঁর চেনা চৌড়াইকে এমনভাবে বদলেছিলেন যাতে সে সারাদেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। 'যমুলা আঁচলে' রেণু তাঁর চেনা চরিত্রগুলিকে সাজিয়েছেন যাতে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে ওঠে।

স্থানীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা দুজনের উপন্যাসেই প্রতিফলিত। দুজনেই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসোপযোগী পটভূমি ও পরিবেশের সন্ধান পান। সেই সঙ্গে উপন্যাসে উপজীব্য বহু চরিত্র ও ঘটনা। পল্লী ভারতের সাথে দুজনের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। [illegible]। ভারতবর্ষকে ধরবার জন্য দুজনকেই পল্লীগ্রামকে আশ্রয় করতে হয়েছে। দুই উপন্যাসেই দুই লেখকের দেহাতী জীবনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত নিবিড় সম্পন্ন কৃষক সন্তান রেণুর পূর্ণিয়ার পল্লী ছিল নিজস্ব জগৎ। 'উচ্চমধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ও Sophistication থাকা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে গ্রামের ভ্রমনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা সতীনাথকে ঐ বিশিষ্টতা দিয়েছিল। বিহারের লোক জীবনের গোটা প্রকরণটাই যেন তার আয়ত্তে ছিল।

ফণীশ্বর নাথ রেণুর রচনায় যে নতুন জীবনধর্মী ফর্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা তৎকালীন হিন্দীসাহিত্যে ছিল। অভিনব। সতীনাথের প্রখর আঙ্গিক সচেতনতা রেণুর উপন্যাসে মেলে না। ময়লা আঁচলে মেরীগঞ্জ গ্রাম - সেখানকার সমাজ ও জনতা মূল আখ্যানের পটভূমি মাত্র নয়, নিজস্বমূল্যে বিশ্বয়ীভূত হয়ে উঠেছে। মেরীগঞ্জের সমাজ বিন্যাস, ভূমি ব্যবস্থা, কৃষিকর্ম, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও ঋতু পরিবর্তন, জীবনধারার রংবদল, সাংবাৎসরিক পালা পার্বন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদির বিবরণ কাহিনীলগ্ন হয়ে উপন্যাসকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মিলিতভাবে রেণু তাঁর উপন্যাসে উত্তর বিহারের এক একটি অঞ্চলকে প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় উন্নীত করেছেন। 'ময়লা আঁচলে' ঢোঁড়াই এর মত নায়কচরিত্র সংশয়াতীত ভাবে নির্দেশ করা যায় না। 'ময়লা আঁচলে' ঘটনা উপস্থাপনা পদ্ধতি 'ঢোঁড়াইচরিত মানসে'র তুলনায় শিথিল, তীক্ষ্ণ-একমুখী নয়। উপসংহারে কোন তীব্র উপলব্ধি বা প্রগাঢ় ব্যাঞ্জনাময় পরিণতি উপস্থিত হয় না, বরং মনে হয়, দ্বন্দ্ব ও গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে, কাহিনীর প্রাণশক্তি ক্ষীন হয়ে যবনিকাপাত ঘটল। 'ময়লা আঁচলের' প্যানারমিক (Panaromic). প্লটবিন্যাস, অনিবার্য ঘটনা স্রোত,

চরিত্র ও পটভূমির ওতপ্রোত সংযোগ এবং দেশ ও কালের সুবিশাল পটকে ধারণ করার মহাকাব্যিক বিস্তার আমাদের বাঙালী উপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্য অনুরাগী রেণুর যৌবনে তারাশংকর অত্যন্ত প্রিয় লেখক ছিলেন। ময়লা-আঁচলের সাথে 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের সাদৃশ্যের কথা অনেকেই বলেছেন। তারাশংকর ও রেণুর এই সাদৃশ্য সম্পর্কে সুপরিচিত কয়েকজন হিন্দী সাহিত্যিক ও সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল।

ডা: ি কুমার বিমল - "রেণু কী আঞ্চলিক কৃতিয়ো কো পড়কর সতীনাথ ভাদুড়ী হী নহী, তারা শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভী 'চন্ডীমন্ডপ' আউর 'পঞ্চগ্রাম' জৈসে গ্রামভিত্তিক গল্প বরবস ইয়াদ আ জাতে হ্যায় ....". [২৩]

ঢোঁড়াই চরিত মানসের হিন্দী অনুবাদক শ্রী মধুকর লিখেছেন - 'মৈলা আঁচল হিন্দী কা আয়াত উপন্যাস ইসলিএ হ্যায় কি লেখক শ্রী রেণু নে বড়ে হী কৌশল সে ভাদুড়ী কে 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' কে নীচে কার্বন রখকর ইসকা আলেখন কিয়া হ্যায়। তারাশংকর কী কথাকারিতা কো রেণু নে আদর্শ কে রূপ মে স্বীকারা হ্যায়, কিন্তু ইহ আদর্শ মাত্র মানসিক আদর্শ রহ গয়া হ্যায়, কিন্তু ইহ আদর্শ মাত্র মানসিক আদর্শ রহ গয়া হ্যায়। 'মৈলা-আঁচল কী ভাষা, টোন, স্থাপত্য, নিষ্কর্ষ কুছ ভী হিন্দী সে মেল নহী রখতা। শ্রী ভাদুড়ী নে পূর্ণিয়া কে ততমা, ঘাডর, বাবু আদি কী কথা জিস অন্দাজ, শক্তি আদর্শ এবং কলাকারিতা সে কহী হ্যায়, অগর পাত্রো কে নাম, ঘটনাও কী তিথি এবং উপশীর্ষকো কো অলগ কর দিয়া জায়ে তো 'মৈলা আঁচল' কে লিখনে কা কোই প্রয়োজন নহী রহ জাতা হ্যায়।" [২৪]

মধুকর গঙ্গাধরের এই উক্তি যতটা আক্রমনাত্মক, ততটা বিশ্লেষনাত্মক নয়। বাংলা উপন্যাসের অগ্রগামীতা ও বাংলা সাহিত্যের সাথে রেণুর গভীর যোগাযোগের কথা স্মরণ করলে সতীনাথ, তারাশংকর তো আছেনই সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্র সহ আরো অনেকের

সাথে এই সাদৃশ্য মনে পড়বে। হিন্দী সাহিত্যিক ও সমালোচক অজেয়'এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রনিধানযোগ্য - "শরৎ কে পল্লী সমাজ মে জী গাঁও কে মটেলে যথার্থ কে বীচ মাণবীয় করুনা কী ধারা বহতী দীখতী হ্যায় (আউর হাঁ রেণু মে কই জগহ উস ভাবুকতা কা জী সংস্পর্শ মিলেগা জো শরৎ মে থা আউর প্রায়শঃ বাঙলা উপন্যাসো মে রহতা হ্যায়, যদাপি উত্তর কালীন কহানিয়ো মে রেণু উসসে মুক্ত হো চুকে থে)।[২৫]

তারাপংকরের কাহিনী বিন্যাসের, শরৎ চন্দ্রের ভাবুকতা তথা মানবীয়তা রেণুর প্রথম দুটি উপন্যাস, 'ময়লা আঁচল' ও 'পরতি পরিকথায়' বিদ্যমান।

'চোঁড়াইচরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচলের' গঠনরীতির আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষণীয় - রেণু সজ্ঞানে উত্তর বিহারের জনজীবনে দেখা জৈবিক স্পন্দনকে সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে যৌনতা নরনারীর স্বাভাবিক জীবনোল্লাসের অংশ, সমগ্র জীবনাবেগের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টি থেকে দেখলে তা অনেক সময়ই নৈতিক রূপ মনে হয়, অযথা এই দিককে রেণু বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। 'ময়লা আঁচলে'র মেরীগঞ্জ গ্রামে নৈতিক সম্পর্কের ছড়াছড়ি, মঠের কোঠারিন লক্ষ্মীদাসী থেকে তহশীলদারের মেয়ে কমলা কেউ এর থেকে মুক্ত নয়। রেণু এই সম্পর্কের গুরুত্ব দেবার জন্য বহু সমালোচিত হয়েছেন - 'কুছ সমীক্ষকো নে রেণু কী ইসলিএ আলোচনা কী হ্যায় কি স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধো কো কে লেকর উস্থানে একাধী দৃষ্টি হী অপনাই হ্যায়, আউর উসকে সুস্থ পক্ষ কো উপেক্ষিত কর দিয়া হ্যায়।"[২৬]

চোঁড়াইচরিত মানসের চরিত্রগুলির আচরণ যেন অনেক পরিশীলিত ও ঔচিত্য বোধে মাত্রায়িত। সতীনাথের মধ্যে নর-নারীর সম্পর্কের চিত্র অত্যন্ত মননদীপ্ত। তিনি বিদগ্ধ নাগরিক বুদ্ধি জীবির সমস্তগুন নিয়েও বিহারের নিম্নতর সমাজের দুর্গম প্রান্তের ছোট গৃহকোনের মৃত্তিকার আস্বাদটুকু থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করেন নি। রেণুর মধ্যে সতীনাথের মত নাগরিক বৈদগ্ধ, ইংরাজী, ফরাসী, তথা কন্টিনেন্ট সাহিত্যের প্রগাঢ় পাঠ ছিল না, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিল সরল-সহজ মাণবিক উদারতা। সতীনাথের উপন্যাসে যে

চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রকাশিত হয় তার সঙ্গে তুলনায় রেণুর জীবন দৃষ্টির সহজ সরলতা পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ শিক্ষা, ব্যাপক অধ্যয়ন, কন্টিনেন্টের সাহিত্যের প্রভাবের চেয়ে, পল্লীজীবন তাকে এক ঋজু দৃষ্টি দিয়েছিল, যা পূর্ণিয়ার প্রকৃতির মতোই উন্মুক্ত ও সুতস্ফূর্ত। পল্লীজীবনের রূপায়নে 'চেতনাপ্রবাহভিত্তিক' জটিল মনোবিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম চর্চার প্রয়োজন তার হয়নি।

এ প্রসঙ্গে সন্তোষকুমার মজুমদার সুধাংশু শেখর চৌধুরীর যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তা উপস্থিত করছি এতে সতীনাথ ও রেণুর তুলনামূলক আলোচনা অনেক পরিষ্কার হবে - "হিন্দী সাহিত্যে সতীনাথের প্রভাব এখনও সঠিকভাবে আসেনি, এটি আমার অনুমান। 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' উপন্যাসদুটির অনুবাদ হিন্দীতে হয়ে গেছে, কিন্তু প্রচারের অভাবে হিন্দী অনুবাদ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান পায়নি। সতীনাথ শরৎচন্দ্রের মত জনপ্রিয় লেখক নন এবং তাঁর উপন্যাসও বহুপঠিত নয়। কিছু কিছু হিন্দী লেখকরা সতীনাথ সম্বন্ধে আগ্রহী, ফণীশ্বর রেণুর নাম করা যেতে পারে, তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ময়লা আঁচল'-এ সতীনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। সতীনাথের লেখায় style অননুকরণীয় এবং হিন্দী সাহিত্য বোধ হয় এখনো ততটা অগ্রসর হয়নি। হিন্দী সাহিত্যে এখনো শরৎচন্দ্রের প্রভাব অপ্রতিহত ভাবে চলছে।" একথাই বললেন মৈথিলী ভাষার খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রী সুধাংশু শেখর চৌধুরী। তিনি মৈথিলী ভাষায় রচিত 'ই বতাহা সংসার উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর মতে "প্রেমচাঁদ অপেক্ষা শরৎ চন্দ্রের প্রভাব বেশি, অন্তত লেখকদের কাছে। সতীনাথের 'জাগরী' তিনি পড়েছেন এবং সতীনাথের লিখনভঙ্গীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। অন্তঃসংলাপ ও চেতনা প্রবাহের রীতি হিন্দী সাহিত্যেও আসছে, হয়তো সতীনাথ ও সমজাতীয় লেখকের পরোক্ষ প্রভাব।" [২৭]

'ময়লা আঁচল' ও 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' দুই লেখক ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। শুধু উপভাষা বা গ্রামের ভাষা নয়, চরিত্রানুগ ভাষা বর্ণনার

প্রয়োজনে নতুন শব্দ সৃষ্টি, [illegible] ভাষা মিশ্রন ইত্যাদি। পূর্ণিয়ার বিহারী- বাঙালী মিশ্র সংস্কৃতির কথা আলোচনা করেছি। বাংলা-হিন্দী দুটি ভাষাই এ অঞ্চলের লোকদের পরিচিত। স্থানীয় বাতাবরণ ফোটাবার জন্য হিন্দী উপন্যাস 'ময়লা আঁচলে' রেণু যেমন বাংলা বাক্য ব্যবহার করেছেন, সতীনাথ তেমনি তার বাংলা উপন্যাসে হিন্দী বাক্য ব্যবহার করেছেন। অপরিচিত আঞ্চলিক শব্দ, চেনা শব্দের গ্রাম্য অপভ্রষ্টরূপ ইত্যাদিতে দুজনের সাদৃশ্য আছে।

'ময়লা আঁচলে'র সাথে ঢোঁড়াইচরিত মানসের যে সাদৃশ্য তা কাহিনীগত, ভাবনাগত কিন্তু প্রকাশশৈলী সম্পূর্ণ আলাদা। দুটি উপন্যাসের শিল্প সার্থকতা ভিন্ন, পরিনামী সঙ্গতিও এক নয়।

'ঢোঁড়াইচরিত মানস'-এর পরিবেশকে বিভিন্ন জন ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন, প্রগতিবাদী সমালোচকেরা মনে করেছেন ঢোঁড়াই-এর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সমূহের ব্যর্থতা দেখিয়ে লেখক ছোট করেছেন জনগনের শক্তিকে। সাধারণ পাঠকের কাছে ঐ উপন্যাসের আশাহীন ও অনুজ্জ্বল পরিসমাপ্তি নিরর্থক মনে হয়েছে। কিন্তু ঢোঁড়াই-এর ব্যর্থতাবোধ ও কারাগারে আত্মসমর্পণ করবার সত্যিকারের তাৎপর্য অন্য জায়গায়।

শ্রদ্ধেয় শ্রী গোপাল হালদারের মতে - "সতীনাথ বুঝেছেন গান্ধী আন্দোলনের উত্তর পুরুষ নেই। অন্তরের সততাকেই তিনি দেখেছেন - জনজীবন থেকে তা বিচ্ছিন্ন।" দ্বিতীয়ত: - মহাকাব্যের আকারে পরিকল্পিত এই উপন্যাসে মহাকাব্যের মতোই আছে - "কথা বস্তুর ব্যাপ্তি ও ভাববস্তুর নীতি সচেতনতা, আছে নায়ক - চরিত্রের বলিষ্ঠ ব্যাক্তিত্ব, আর মহাকাব্যের মতোই তা শেষ হয়েছে সবিষাদ শান্তরসে। নিরাশ্রয় ও কারাগারবাসী ঢোঁড়াই সৎ সচেষ্ট ভারতবাসীর সঠিক মাণসিক পরিণতির ছবি।"

'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচলে' দুই লেখকের জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ ভিন্ন। দুজনের জীবনবোধ এত পৃথকধরনের যে এই দুটি উপন্যাস ভারতবর্ষকে ভিন্ন দুটি দিক থেকে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। একটি যা দেয় অপরটি তা দিতে পারেনা। রেণুর উপন্যাসে যে আশার ছোঁয়া থাকে তা মূলত আদর্শবাদ প্রসূত ও আবেগজাত। তাই 'ময়লা আঁচলে'র ডাঃ প্রশান্তর সঙ্গে লেখকের একাত্মতা সমগ্র উপন্যাসের তাৎপর্য্য বদলে দেয়। ভারতমাতার ময়লা আঁচলের পরিবর্তে প্রধান হয়ে ওঠে, - 'শরৎবাবুর উপন্যাসের সেই চিরন্তনী নারী। বিশ্বাসে অটল, মমতায় উজ্জ্বল, আজো এগিয়ে চলেছে। রূপ বদলায়, নাম বদলায়, স্থানকালের রূপান্তর ঘটে - শাশ্বত নারীর চরিত্র তবু কোথাও এক তিল বদলায় না। অন্যদিকে সতীনাথ পরিবর্তমান ভারতীয় সমাজকে ধরতে চান সেখানে চিরন্তনী নারী বলে কেউ নেই, রামিয়া নেই সাগিয়া নেই - "জুয়োর খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে সে। অবচেতনের মতো সে উঠোন থেকে বেরিয়ে আসে। এই নিসীম রিক্ত জগৎটার মধ্যে, 'পাক্কী' না কী নামের যেন একটা অপরিচিত রাস্তা দিয়ে সে চলছে। ঠিক অনুতাপ নয়। হতাশার গ্লানি তার নিঃসঙ্গতাকে আরও নিবিড়, আরও দুঃসহ করে তুলেছে। একেবারে একা সে আজ এই দুনিয়াতে। বুকের বোঝার চাপে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।" ঢোঁড়াই তো প্রশান্ত ডাক্তারের মতো শিক্ষিত রাজনীতি সচেতন সমাজকর্মী নয়, তাই প্রশান্তর মতো কখনোই সে বলতে পারেনা (ভাবতেও পারে না) - 'আমি আবার কাজ শুরু করবো - এইখানে এই গ্রামে। আমি ভালবাসার চাষ করব, মমতা, অশ্রুসিক্ত মাটির বুকে ভালবাসার নতুন চারারা সতেজ সজীব হয়ে উঠবে। আমার সাধনা শুরু হবে - পল্লী মায়ের ময়লা আঁচলের ছায়ায়।"

সতীনাথ ঢোঁড়াইএর মধ্যে ধরতে চান সারা দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিকে, এর মধ্যে লেখকের বিশ্বাস ও আদর্শ কাজ করলেও লেখক রামায়নকারের মতোই প্রচ্ছন্ন, যে জন্য এক সময়ে তিনি ভেবেছেন যতদিন বাঁচবেন ঢোঁড়াইদের মনের পরিবর্তনের রূপরেখা

এঁকে যাবেন। আসলে ঢোঁড়াই-এর নামরূপ থাকা সত্ত্বেও ঢোঁড়াইচরিত মানস কোনো ব্যক্তি-ঢোঁড়াইয়ের কাহিনী নয় – 'ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমনভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুল ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে তাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীন সমাজ তুলে ধরবার ইচ্ছা। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে।' 'ময়লা আঁচলে' ফণীশ্বর নাথ রেণু সমাজ ও রাষ্ট্র সচেতনা হয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির কথাকার, ঢোঁড়াই চরিত মানসে সতীনাথ ভাদুড়ী ব্যক্তির মনঃসমীক্ষনে অগ্রণী হয়েও শেষ পর্যন্ত সমাজবদ্ধ মানুষের চরিত্ররূপ রচয়িতা।

'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' দুটি উপন্যাসের লেখকদুয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের দরিদ্র অবহেলিত বিশাল জনগণের একজনকে দেশের প্রগতি চেতনার বাহক করে তোলা ও তারমধ্যে 'ভারতীয়ত্ব' প্রতিফলিত করবার পরিকল্পনা কাজ করেছে। একে কি শুধু দুই লেখকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রভাব বলব ? নাকি দুজন সৎ ভারতীয় লেখক এমনকিছু সমকালীন প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন যা একই অঞ্চলের অধিবাসী দুটি ভিন্ন ভাষার লেখক নয়, ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলের যে কোন ভাষার লেখকই তুলে আনতে পারেন। যার ফলশ্রুতি দুটি ভিন্ন শিল্পসৃষ্টি, দুটি ভিন্ন উপন্যাস।

উল্লেখপঞ্জী

১। সতীনাথ গ্রন্থাবলী। সম্পাদনা : শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য ১ম খন্ড, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৮৭৩। পৃ: ৩

২। সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা। গোপাল হালদার কলিকাতা, অয়ন, ১৯৭৮। পৃ: ১১৮-১১৯।

৩। উত্তর প্রসঙ্গ : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় , কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৩। পৃ: ১২২

৪। সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা । গোপাল হালদার, কলিকাতা, অয়ন, ১৯৭৮ পৃ: ১১৯।

৫। সতীনাথ ভাদুড়ী : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান। সতীনাথ ভাদুড়ী : উপন্যাস ও রাজনীতি, শীলিনী ভট্টাচার্য। কলকাতা, জলার্ক, ১৩৯৪। পৃ: ১৬৭

৬। সতীনাথ স্মরণে। সম্পাদনা : সুবল গঙ্গোপাধ্যায়। পাটনা, ভারতী ভবন, ১৯৭২। পৃ: ১০৫

৭। সতীনাথ স্মরণে। সম্পাদনা : সুবল গঙ্গোপাধ্যায়। পাটনা। ভারতীভবন, ১৯৭২। পৃ: ১০৭

৮। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অশ্রু কুমার সিকদার। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮। পৃ: ২৪৭

৯। সতীনাথ ভাদুড়ী : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান। রামায়নী জট ও ঢোঁড়াই, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা, জলার্ক, ১৩৯৪। পৃ: ৫১

১০। সতীনাদ গ্রন্থাবলী। সম্পাদণা : শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। ২য় খন্ড। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩। পৃ: ৪১৯।

১১। সতীনাথ ভাদুড়ী : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান। সতীনাথ ভাদুড়ী : উপন্যাস ও রাজনীতি, মালিনী ভট্টাচার্য। কলকাতা, জলার্ক, ১৩৯৪। পৃ ১৬১

১২। সতীনাথ গ্রন্থাবলী। সম্পাদনা : শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য। ২য় খন্ড। পৃ : প্র। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭৩।

১৩। সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা। গোপাল হালদার। কলিকাতা, অমৃত, ১৯৭৮। পৃ ১১৬

১৪। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস। অশ্রুকুমার সিকদার। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৮। পৃ : ২৫৫-২৫৬

১৫। মৈলা আঁচল : ফণীশ্বর নাথ রেণু। অনুবাদ : প্রসূন মিত্র। নয়া দিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৫

১৬। রেণু স্মরণ আউর শ্রদ্ধাঞ্জলী। সম্পাদক, রাম বৃক্ষ ওন সিং ও ডা: রামবচন রায়। পাটনা, নবনীতা, প্রকাশন, ১৯৭৮। পৃ ২৪৩

১৭। উপন্যাস কা যথার্থ আউর রচনাত্মক ভাষা। ডা: পরমানন্দ শ্রী বাস্তব। নয়াদিল্লী, ন্যাশনাল পাব্লিশিং হাউস, ১৯৭১। পৃ ৪৩

১৮। আধুনিক হিন্দী উপন্যাসোঁ মে বস্তু-বিন্যাস। ডা: সরোজিনী ত্রিপাঠী। কানপুর, গ্রন্থম, ১৯৭৩। পৃ ২৩৭

১৯। উপন্যাস কা যথার্থ আউর রচনাত্মক ভাষা। ডা: পরমানন্দ শ্রী বাস্তব। নয়াদিল্লী, ন্যাশনাল পাব্লিশিং হাউস, ১৯৭১। পৃ ৪৮

২০। 'মৈলা আঁচল কী রচনা-প্রক্রিয়া। ডা: দেবেশ ঠাকুর। নয়া দিল্লী, বাণী প্রকাশ, ১৯৮৭। পৃ ১০

২১। ফণীশ্বর নাথ 'রেণু' কা সাহিত্য। ডা: অঞ্জলী তেওয়ারী। নয়াদিল্লী, ঋষভ চরণ জৈন এবম্ সন্ততি, ১৯৮৩। পৃ - ৬৩

২২। বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা। সত্যেন্দ্র নাথ রায়। কলিকাতা, গ্রন্থালয়, ১৩১৪। পৃ: ১৩৩।

২৩। রেণু সংস্মরণ আউর শ্রদ্ধাঞ্জলী। সম্পা: রামবৃক্ষবেনীপুরী সিং। ১৯৭৮ পৃ - ৬২

২৪। আঞ্চলিকতা আউর হিন্দী উপন্যাস। ডা: নগীনা জৈন নয়াদিল্লী, অক্ষর প্রকাশন, ১৯৭৮। পৃ: ২৫৫।

২৫। রেণু সংস্মরণ আউর শ্রদ্ধাঞ্জলী। সম্পা: রামবৃক্ষবেনীপুরী সিং, ১৯৭৮, পৃ: ৪

২৬। 'মৈলা আঁচল' কী রচনা-প্রক্রিয়া। ডা: দেবেশ ঠাকুর। নয়াদিল্লী, বাণী প্রকাশ, ১৯৮৭। পৃ:

২৭। সতীনাথ ও পূর্ণিয়া। সন্তোষ কুমার মজুমদার। জলার্ক নভেম্বর ৮০ জুন - ৮১, কলকাতা।

২৮। সতীনাথ ভাদুড়ী: সাহিত্য ও সাধনা। গোপাল হালদার, কলিকাতা, অয়ন, ১৯৭৮। পৃ: ৫১